ইকবাল আলমগীর কবীর

আসিমভ

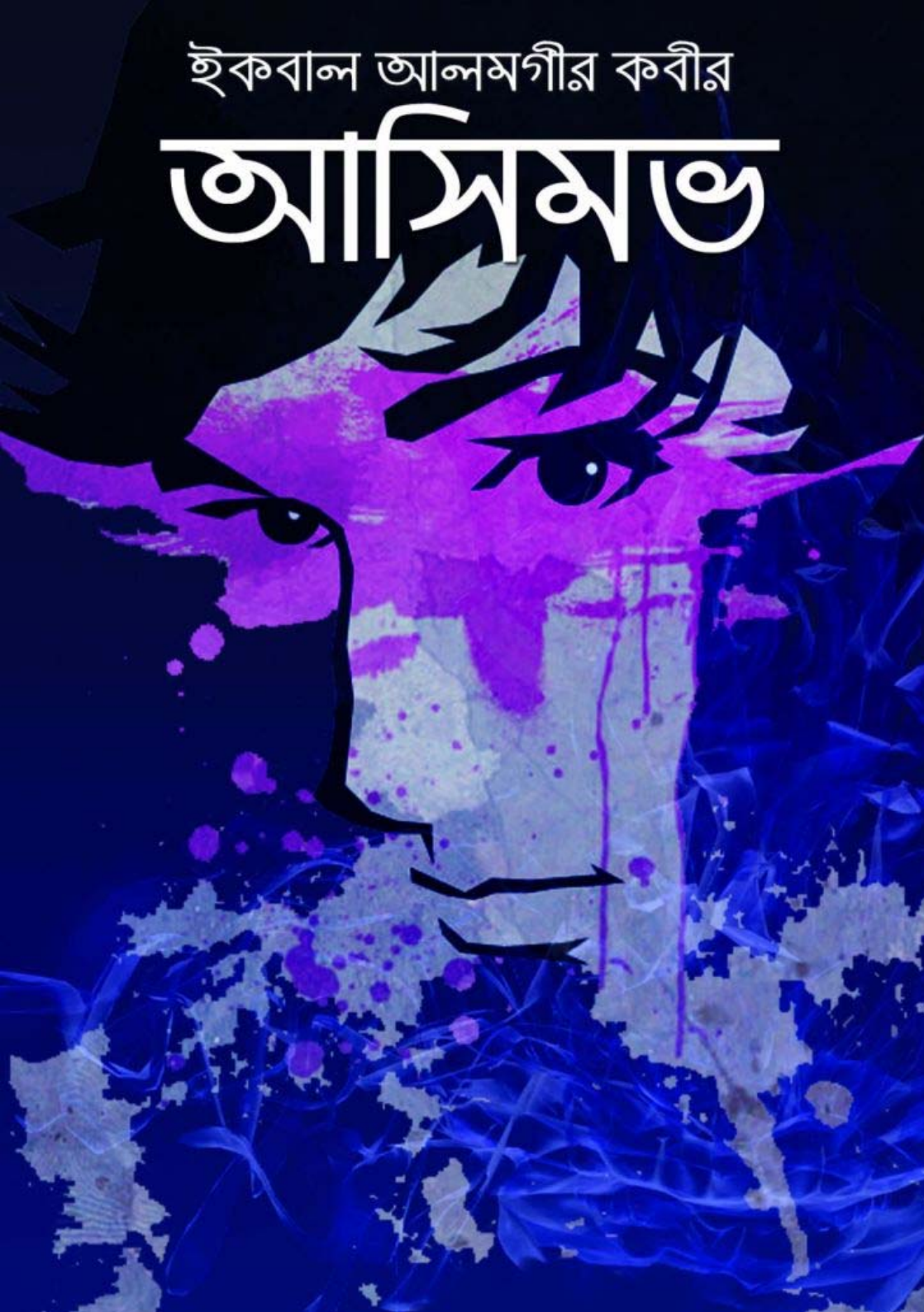

আসিমভ

ইকবাল আলমগীর কবীর

ও ঘরের বাইরে যেতেই আমি মনিরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, ‘বাঙালী ছেলের নাম আসিমভ কেন?’

কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থাকল মনির। তারপর জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। আসিমভকে দেখা যাচ্ছে। হেঁটে যাচ্ছে সামনের দিকে। সামনের ফাঁকা যায়গাটুকু পেরিয়ে কাঠের গেটটা খুলে বাইরে গেল। বাইরে থেকে গেট বন্ধ করে বামদিকে ঘুরে চোখের আড়ালে চলে গেল।

আমার দিকে না তাকিয়েই মনির অন্যমনস্কভাবে বলল, ‘ওকে বাঙালী মনে হওয়ার কারনগুলো ঠিক কি কি বলতে পার?’

আমি অবাক হলাম। বাঙালী মনে না করার কি কারন থাকতে পারে! বললাম, ‘কেন, ওর চেহারা বলে দিচ্ছে ও বাঙালী। আর তুমি তো বাংলাতেই কথা বললে ওর সাথে।’

‘ওকি বাংলায় কথা বলেছে?’ পাল্টা প্রশ্ন করল মনির।

‘ও কোন শব্দই করেনি। কিন্তু কথা সেটা না, ওকে দেখে রাশান বলেও তো মনে হয় না। আসিমভ তো রাশান নাম।’

মনির একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষন। তার গলার স্বর আরো নিচুতে নেমে গেল, ‘কে?’

আমি ইতস-ত করে বললাম, ‘আইজাক আসিমভ। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লেখক।’

মনির একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। তারপর জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। একেবারে নিচু গলায় যেন আপন মনে বলে গেল, ‘আইজাক আসিমভ। জন্ম রাশিয়ার প্রেত্রভিচি, জানুয়ারি দুই, উনিশ’শ বিশ। স্কুলে ভর্তি করানোর সময় বয়স বেশি দেখাতে তার জন্ম তারিখ এক বছর পিছিয়ে দেয়া হয়। সাড়ে চারশর ওপর লেখার কথা জানা যায়। বিজ্ঞান বিষয়ে সবচেয়ে প্রগতিশীল, উদ্ভাবনী লেখক হিসেবে পরিচিত। মৃত্যু উনিশ’শ বিরানব্বুই, এপ্রিল ছয়। মৃত্যুর কারন কিডনীর সমস্যা এবং ট্রিপল বাইপাস সার্জারীর সময় এইচআইভিযুক্ত রক্ত দেয়া।’

মনিরের দেয়া তথ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলার কথা আমি ভাবতেও পারি না। আমি জানি, এই তথ্যে কোন ভূল যদি থাকেও সেটা যেখান থেকে তথ্য পেয়েছে সেখানে। ওরকাছে তথ্যের বিকৃতি ঘটেনি।

কথা থামিয়ে বড় করে শ্বাস ফেলে হেলান দিয়ে পা সামনের দিকে ছড়িয়ে দিল মনির। কাঁচের জানালায় লতাপাতা আঁকা পর্দাটা একপাশে গোটানো। বাইরে ঝকঝকে পরিস্কার আলো। সবুজ গাছপালা ছাড়িয়ে চকচকে নীল আকাশ। এখানে সেখানে সাদা মেঘের টুকরো।

মনির সবসময়ই একটু অন্যরকম এটা জানা কথা, কিন্তু এই ছোট একটা বিষয় নিয়ে এত লুকোচুরি করার কি আছে সেটাও বুঝলাম না। এটুকু অন্তত জানি সে মিথ্যে বলে না। সরাসরি প্রশ্ন করাই উচিত। এখনও জানি না এই কিশোরের সাথে তার সম্পর্ক কি। আমি ধরে নিয়েছিলাম তার ছেলে। এখন মনে হচ্ছে সেটা নাও হতে পারে। অবশ্য তার মা যদি রাশান বা অন্য কোন দেশের হয় তাতেও অবাক হব না।

মুখ খোলার আগেই কথা বলতে শুরু করল মনির, 'আসিমভ পৃথিবী সবগুলো প্রধান ভাষা জানে।'

'তারমানে?'

'তারমানে তুমি যদি ডিকসনারী দেখে ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, স্প্যানিস, পর্তুগিজ যেকোন ভাষার কোন শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস কর সে বিন্দুমাত্র ভূল করবে না। প্রশ্ন করলে সব ভাষায় উত্তর দিতে পারবে।'

আমার রহস্যের সমাধান হল না। মনির অত্যন্ত মেধাবী সেটা আমি জানি। তার ছেলে, যদি তার ছেলে হয়, সেও মেধাবী হবে সেটাই স্বাভাবিক। তাই বলে সবগুলো প্রধান ভাষা-, অবিশ্বাস্য। আজকাল কেউ ভাষা শেখা নিয়ে এত মাথা ঘামায় না। দুটা, বড়জোর তিনটা ভাষা জানলে পৃথিবীর সব যায়গায় চলা যায়। শুধুমাত্র ইংরেজি জানলেও চলে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এতটুকু ছেলেকে এতগুলো ভাষা শেখানোর কারন? ওর ওপর চাপ খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে না?'

মনির উত্তর দিল না। চুপ করে বসে থাকল অন্যমনস্কভাবে। ওকে দেখে আমার ছেলেবেলার কথা মনে পরল। স্কুলে একই বেঞ্চে বসতাম দুজন। অত্যন্ত ভাল ছাত্র ছিল মনির। কখনো ফার্স্ট হত না, হতে চেষ্টাও করত না। দুই- তিনের মধ্যে থাকলেই সে সন্তুষ্ট। কিন্তু ওর ধরন আলাদা। ফার্স্টবয় তো দুরের কথা, কোন শিক্ষকও ওর সাথে তর্ক করতে যেত না। একবার এক শিক্ষককে চ্যালেঞ্জ করেছিল। সম্ভবত ফিজিক্সের ক্লাশ পরীক্ষায় একটা অংকে ওকে শুন্য দেয়া হল। পুরো নম্বর দেয়া হল অন্য একজনকে। পরদিন সে একটা কাগজে অংকটা করে শিক্ষকের সাথে দেখা করে বলল, 'আমি অংক করে এই ফল পেয়েছি। আপনি কিভাবে ওই ফল পেয়েছেন আমাকে দেখান।'

শিক্ষক কিছু বলেননি। পরে দেখব বলে কোনমতে বিদায় করেছিলেন। আমাকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল বলে আমি জানি। এটাও জানি সে যেভাবে করেছে সেটাই ঠিক। অথচ ওকে কখনও পড়াশোনা করতে দেখিনি। অন্তত ক্লাশের বই। সারাদিন বাইরের বই পড়ত। ক্লাশে কখনও প্রশ্ন করত না। স্যার যা পড়াচ্ছে তা থেকে দুয়েক লাইন টুকে রাখত একটা খাতায়। একই খাতায় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ সবকিছু। একবার সেদিকে তাকিয়ে বলে দিতে পারত কবে কোন বিষয়ে কি পড়ানো হয়েছে। পরীক্ষার আগে সবসময় আমি তার নোটবুক দেখতাম। ও সাগ্রহে খাতাটা সামনে খুলে আমাকে বুঝিয়ে যেত।

আমার সাথে ওর খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। আসলে আমি ওকে বুঝে ফেলেছিলাম। ও পছন্দ করে না এমন বিষয় কখনো তুলতাম না। তারমধ্যে সবচেয়ে যা বড় তা হচ্ছে ওকে বিরক্ত না করা। সেটা সে একেবারেই পছন্দ করত না। হয়ত পুকুরের ধারে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে আছি দুজন। কেউ কোন কথা বলছি না। সেটাই আমার সাথে তার ঘনিষ্ঠতার কারন। অনর্থক কথা বলা যে পছন্দ করত না তাকেই দেখা যেত পছন্দের বিষয় পেলে আগ্রহের অন্ত নেই। যতরকমভাবে যুক্তি দিয়ে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বুঝানো সম্ভব সে চেষ্টা করেই যাবে। এতটুকু বিরক্ত হবে না। একবার টানা তিনঘন্টা আইনষ্টাইন আর আনফিল্ডের থিওরী বোঝানোর চেষ্টা করেছিল। আমি ধরেই নিয়েছিলাম সে শিক্ষক হবে। কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়াবে। বিজ্ঞানের জটিল জটিল বিষয় বোঝার জন্য আগ্রহী ছাত্ররা তাকে ঘিরে ভিড় করে থাকবে।

কিন্তু সেটা হয়নি। হঠাৎ করেই ওরসাথে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। অনেক বছর পর, আমি যখন চাকরি করি একটা বেসরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তখন একদিন একজন জানাল মনিরের সাথে দেখা হয়েছে। জার্মানীতে থাকে। দেশে এসেছে মাসখানেকের জন্য। ঠিকানা জানতে পেলাম না। নিজের ঠিকানা দিয়ে বললাম কখনো যোগাযোগ হলে সেটা দিয়ে দিতে। তারও বছর চারেক পরে যোগাযোগ হয় ওর সাথে। সামনাসামনি দেখা এই নির্জন জায়গায়। মাইলখানেকের মধ্যে দ্বিতীয় বাড়ি নেই। শুধুই গাছপালা আর এখানে ওখানে ছোটছোট কিছু ফসলের জমি। ওই জমিতে যারা চাষ করে তাকে থাকে ওপাশের গ্রামে। ধানখেতের পাশে দাঁড়ালে দুর থেকে গাছপালার ঝোপ দেখা যায়। ঘরবাড়ি একটাও চোখে পরে না।

মনিরের জন্য একেবারে মানানসই যায়গা।

মনির তখনও চুপ করে বসে। ছোটবেলার স্বভাব এখনো যায়নি। তারপর একসময় আপনমনেই আসে- করে বলল, ‘আসিমভ, আসিমভ।’

তারপর সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আসিমভ না হয়ে অসীম হলে ভাল হত তাইনা? বাংলা নাম। খুব সুন্দর অর্থ। যার কোন সীমা নেই। সাধ্যের অসাধ্য কিছু নেই। অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। অসীম জ্ঞান, অসীম শক্তি, অসীম সাহস, অসীম প্রতিভা-’

আমি কি বলব খুঁজে পেলাম না।

মনির আবারো হারিয়ে গেল নিজের মধ্যে। আপনমনে বলতে থাকল, ‘অসীম আকাশ, অসীম সমুদ্র-।’

মনিরের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এভাবে নিজেনিজে কথা বলার অভ্যেস ওর ছিল না।

আমাকে বয়ে এনেছে যে গাড়ি তার চালক, কিছু একটা রহমান এতক্ষন গাড়ি থেকে জিনিষপত্র নামিয়ে নিজেই ভেতরের ঘরে রেখে আসছিল। বোঝা যাচ্ছে একাজ তাকে প্রায়ই করতে হয়। পথে নিতান্ত প্রয়োজনীয় দুএকটা কথা ছাড়া তারসাথে আমার কোন আলাপ হয়নি। এখানে এসেও সে কারো সাথে কোন কথা বলেনি। আমার ব্যাগদুটো নামিয়ে দিয়ে গাড়ির জিনিষপত্র নামাতে শুরু করেছে। এখন কাজ শেষ করে সামনে এসে দাঁড়াল।

‘টাকাপয়সা লাগবে?’ জিজ্ঞেস করল মনির।

‘জ্বী-না।’ বলল রহমান।

‘আচ্ছা, ঠিক আছে।’

রহমান আমার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে মৃদু হাসল। তারপর সালাম জানিয়ে চলে গেল বাইরে। একটুপরই গাড়ির শব্দ শুনতে পেলাম। দুরে মিলিয়ে গেল।

মনির চুপ করে বসে রয়েছে। আমি ভাল করে আরেকবার দেখলাম ওকে। ওর স্বাসে'র মারাত্মক অবনতি হয়েছে। দেখে বোঝা সম্ভব না কারন দেখতে ও বরাবরই একসকম। বোঝা যায় চলাফেরায় ধীর গতি দেখে, থেমে থেমে কথা বলার ভঙ্গিতে। মাথার চুল কমে গেছে অনেক। তবে ফাঁকা হয়নি কোথাও। আসিমভের চুলও একই রকম। পুরো মাথা জুড়ে ছড়ানো। ছোটবেলার মনিরের মত।

ওর বিশ্রাম দরকার । কদিন থাকব বলে এখানে যখন এসেছি তখন কথা বলার অনেক সময় পাওয়া যাবে। তারচেয়ে বরং আসিমভের সাথে কিছু সময় কাটানো যাক। ছেলেটাকে আমার পছন্দ হয়েছে। লাজুক চেহারা, মিষ্টি মায়াময় মুখ। বড়বড় কালো চোখ। মনিরের ছোটবেলার চেহারার সাথে কিছুটা মিল রয়েছে বলে মনে হয়। তবে মনির সবসময়ই রোগা ছিল। আসিমভের স্বাস্থ্য ভাল। ভরাট গাল। আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় সোজা তাকিয়ে শুধু একটু হেসেছে। তাতেই ওর সরল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ওর সাথে সময় কাটাতে আমার কোন সমস্যাই হবে না।

আমি ওঠার ভঙ্গি করে বললাম, 'তুমি বিশ্রাম নাও। আমি চারিদিক একটু দেখে আসি।'

মনির হেসে বলল, 'হ্যাঁ। তোমার খুব পছন্দ হবে যায়গাটা। আসিমভের সাথে আলাপ কোর।'

আমি 'হুঁ' বলে বাইরে রওনা হলাম।

সন্ধ্যে হতে এখনও বেশ দেরী। গাছের মাথায় রোদ চকচক করছে। বর্ষা এখনো শুরু হয়নি। যদিও চারিদিকে বৃষ্টি হওয়ার লক্ষন দেখা যাচ্ছে। আমি আসার আগে বৃষ্টি হয়েছে। গাছপালা, ঘাস, রাস্তা সব পরিস্কার করে দিয়ে দিয়ে গেছে যেন কেউ। ধবধবে সাদা কাঠের গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকিয়ে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল।

চারিদিকে শুধুই গাছপালা। ছোট-বড়=মাঝারি। গাঢ় সবুজ, হাল্কা সবুজ। একটা কৃষ্ণচুড়া মাথা উচিয়ে আছে। টকটকে লাল রঙের ফুলে ছেয়ে আছে ডালপালা। তার গা ঘেসে জারুল গাছ। যেন রঙ মিলিয়ে পাশাপাশি রাখা হয়েছে ওদের। গাছপালার মাঝখানে সাদা-সবুজ রঙের মনিরের বাড়ি। বিদেশী পোষ্টকার্ডে পাহাড়ি এলাকায় এধরনের বাড়ির ছবি দেখেছি। মনির কিভাবে এমন যায়গায় এমন একটা বাড়ির মালিকানা পেল ভেবে পেলাম না।

আমি মুল রাস্তার বিপরীত দিকে পা বাড়ালাম। আসিমভকে এদিকেই যেতে দেখেছি। আসার পথে অন্য দিকটা দেখেছি। রাস্তার এপাশে কিছু বড়বড় গাছপালা আর ওপাশে হাল্কা গাছপালার মাঝেমাঝে ফসলের জমি। এদিকটা দেখে নেয়া যাক।

সামনের পরিস্কার রাস্তা কিছুদুর এগিয়ে শেষ হয়ে গেছে। তারপর একটা টিলার মত। তারপর শুধুই গাছ। কয়েকপা এগিয়ে আমি গাছপালার দিকে ঘুরলাম। কিছুদুর এগোলে কৃষ্ণচুড়া গাছটার গোড়ায় যেতে পারব।

এখন পাখিদের ঘরে ফেলার সময়। চারিদিখে পাখিদের প্রচন্ড কিচিরমিচির। একটা গাছ দেখে মনে হল সেখানে শতশত পাখি লাফালাফি করছে। আমি চেষ্টা করে একটা পাখিরও দেখা পেলাম না। শুধু শব্দ শোনা যাচ্ছে আর পাতার নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে। চারিদিকে মৌমৌ করছে হাসনাহেনার গন্ধ।

কয়েকপা এগিয়ে কৃষ্ণচুড়া গাছটা দেখতে পেলাম। গাছের তলায়, বলতে কি পুরো এলাকাই বেশ পরিস্কার। নিয়মিত পরিস্কার না করলে প্রচুর ঝরাপাতা, ডালপালা, আবর্জনা থাকার কথা। সেসব কিছু নেই। আমি বেশি ভেতরে যেতে সাহস করলাম না। শুনেছি মানুষ বনের মধ্যে খুব সহজে দিক ভুল করে। আর সন্ধ্যেও নামে একেবারে হঠাৎ করে। আমার সামনে এটা রীতিমত বন। এখানে পথ হারিয়ে অন্ধকারে ঘুরে বেড়ানোর কোন অর্থ হয় না।

আমি এক যায়গায় দাঁড়িয়ে ডাকলাম, 'আসিমভ-।'

সাথেসাথে সাড়া এল সামনের দিক থেকে, 'জ্বি।'

এই প্রথম আসিমভের গলা শুনলাম। হঠাৎ করেই মনেহল ওকে দেখে বয়স যা মনে হয় সত্যিকারের বয়স হয়ত তারচেয়েও কম। চিকন রিনরিনে গলা। যে বয়সে গলার স্বরে পরিবর্তন হয় সেই বয়সে এখনো পৌছেনি। একটু পরই ওকে দেখতে পেলাম হাসিমুখে এগিয়ে আসছে।

মুখে হাসি এনে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি করছিলে?'

আসিমভ বলল, 'কিছু না। এদিকে অনেক পাখি।'

তারমানে পাখি দেখছিল অথবা পাখির শব্দ শুনছিল। আমি বললাম, 'আমি যখন তোমার সমান ছিলাম তখন আমি আর মনির পাখি দেখতে যেতাম। কোনটা কি পাখি, দেখতে কেমন, কিভাবে ডাকে এইসব খাতায় লিখে রাখতাম।'

আসিমভ শব্দ না করে হাসল। মুহুর্তের জন্য ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখা গেল। তারপর হাসিটা লেগে থাকল মুখের পাশে।

আমি আগের বিষয় নিয়ে কথা চালিয়ে গেলাম, 'এখন অবশ্য সবকিছু অনেক সহজ হয়েছে। ইচ্ছে করলে ছবি উঠানো যায়, ভিডিও করা যায়, শব্দ রেকর্ড করা যায়। তোমার ক্যামেরা আছে?'

'জ্বি।'

আমার অবাক লাগল ওর সংক্ষিপ্ত উত্তর শুনে। আজকালকার এই বয়সের ছেলে এমন হয় না। অনেক বেশি চটপটে হয়, অন্তত নিতান্ত হাবা না হলে। পরিবেশের সাথে চট করে মানিয়ে নিতে পারে। নিজের কথা বলে। একে দেখে মনে হচ্ছে বেশি মানুষের সাথে কখনো মেশার সুযোগ পায়নি। অপেক্ষা করছে আমি কি বলব সেজন্য।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার ছবি উঠাতে ভাল লাগে?'

আসিমভ বলল, 'হ্যাঁ।

'কিসের ছবি?'

আসিমভ বলল, 'গাছপালা, ফুল, পোকামাকড়।'

পাখির বিষয় উল্লেখ করেনি বিষয়টা আমার দৃষ্টি এড়াল না। জিজ্ঞেস করলাম, 'পাখির ছবি উঠাও না।'

আসিমভ বলল, 'একটু আগে একটা হামিংবার্ড দেখেছি।'

‘হামিংবার্ড !’

আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। এ নিশ্চয়ই পাখি চেনে না। বাংলাদেশে হামিংবার্ডের মত পাখি রয়েছে বেশ কিছু। তাদেরকে হামিংবার্ড বলা হয় না।

বললাম, ‘মৌটুসি সম্ভবত।’

আসিমভ বলল, ‘মৌটুসি নীল রঙের। এটা কালো আর হলুদ। ওইদিকে উড়ে গেল।’

হাত দিয়ে কৃষ্ণচুড়া গাছটার দিকে দেখাল সে। আমি হুঁ বলে সেদিকে পা বাড়ালাম। আসিমভও সঙ্গ নিল।

আমি দেখতে চেষ্টা করলাম পাখিটাকে। আবারো যদি দেখা যায় ওকে বলে দেব ওর বাংলা নাম কি। দেখতে পেলাম না। আসিমভও চেষ্টা করছে পাখিটাকে আবার দেখার। একসময় হাল ছেড়ে দিয়ে পায়ের কাছ থেকে পরে থাকা একটা ফুল উঠিয়ে নিলাম।

‘আমি আর মনির ক্লাশে বসে এই ফুল দিয়ে কাটাকাটি খেলতাম।’

আসিমভ অবাক হয়ে আমার হাতে ধরা কৃষ্ণচুড়া ফুলটা দেখতে থাকল। নিশ্চয়ই ভাবছে সেটা আবার কেমন খেলা। এই যুগের ছেলের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। এখন সবকিছুই খুব পাল্টে গেছে। হঠাৎ করেই নিজেকে খুব পুরনো যুগের মানুষ মনে হল। মনে হল একে কিছুটা ধারনা দেয়া উচিত আগে আমরা কেমন ছিলাম, তার বয়সে কি করতাম।

ফুল থেকে একটা পরাগদন্ড ছিড়ে সামনের দিকে ধরলাম, ‘দেখ কিভাবে খেলে। তুমি একটা ছেড়। এবার এটার মাথায় লাগিয়ে টান দাও। দেখবে একটার মাথা ছিড়ে গেছে। যারটা ছিড়বে সে হেরে যাবে।’

আসিমভ তার হাতে একটা পরাগদন্ড ধরে রাখল। আমি একটানে ওটার মাথা ছিড়ে দিলাম। দেখে হেসে ফেলল ও।

আমি বললাম, ‘আসলে খেলাটা খুব সহজ। আমি আসে- আসে- দেখিয়ে দিচ্ছি। একটু সাবধানে দেখলেই বুঝবে কোন অংশে টান লাগলে কোনটা ছিড়বে। ঠিকমত ধরাটাই আসল খেলা।’

আমার হাতটা সি'র রেখে ওকে জেতার সুযোগ দিলাম। মনেহল খুব সহজেই শিখে গেছে খেলাটা। তবে খুব পছন্দ করেছে বলেও মনে হল না। নিজেই নিজেকে বুঝালাম, এটাই স্বাভাবিক। আমার কাছে যখন এই খেলা উত্তেজনাকর মনে হত তখন আমার বয়স ওর থেকে অন্তত বছর পাঁচেক কম ছিল। সেই স্মৃতিটা থেকে গেছে এখনো। আর এখন খেলার বিষয়ের অভাব নেই। নিজে না খেলেও ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস থেকে শুরু করে রেসলিং সবই টিভিতে দেখা যায়। কম্পিউটারে সবই খেলা যায়।

জিজ্ঞেস করলাম, ‘তোমার প্রিয় খেলা কি?’

‘দাবা।’

‘হুঁ।’ আমি বললাম, ‘মনিরও খুব ভাল খেলত। কে জেতে তোমাদের মধ্যে?’

আসিমভ বলল, ‘আমি কম্পিউটারে খেলি।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘কোন প্রোগ্রাম?’

‘ফ্রিৎজ।’

আমি নাম শুনেছি এর, কখনো দেখিনি। একসময় দাবা খেলার শখ ছিল, সেটাও মুলত মনিরের জন্যই। তখনও কম্পিউটারের এত প্রচলন শুরু হয়নি। ফ্রিৎজ সম্পর্কে আমি যতদুর জানি এটাকে সাধারন কম্পিউটারের জন্য সবচেয়ে উন্নত দাবার প্রোগ্রাম বলে মানা হয়। গ্রান্ডমাষ্টার পর্যায়ের খেলোয়াররা খেলে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কম্পিউটারকে হারাতে পার?'

আসিমভ বলল, 'কখনো কখনো। অনেক সময় লাগে খেলতে।'

আমার মনে হল বাড়িয়ে বলছে। এই বয়সে ফ্রিৎজ খেলে যে জিততে পারে তার দাবারু হিসেবে রীতিমত নামডাক হয়ে যাওয়ার কথা। অনেকে বিভিন্ন ধরনের কোড ব্যবহার করে গেম শেষ করে। এখানেও তেমন কিছু রয়েছে হয়ত। আবার মনে হল, অনেক সময় লাগার কথা বলছে এটা তো ঠিক। আমি নিজেই একবার রাত কাবার করেছিলাম এক খেলায়। সেটা ফ্রিৎজের তুলনায় নস্যি। এখনকার কম্পিউটারের ক্ষমতা যতই বাড়-ক জটিল গেম খেলতে বহু সময় নেবে। আমি আর এ নিয়ে কথা বাড়ালাম না। কদিন থাকব বলে যখন এখানে এসেছি তখন দেখে নেয়া যাবে। আমার ধৈয্যের অভাব নেই। সম্ভব হলে একসময় দাবার বোর্ড নিয়ে বসে নিজের খেলাটাও ঝালাই করে নেয়া যাবে। ওর সাথে নাহোক, মনিরের সাথে।

আমি আসিমভকে ভাল করে দেখলাম। ওর লাজুক ভাবটা যাচ্ছে না। একবারও সোজা আমার দিকে চায়নি। মাথা নিচু করে রেখেছে, নয়ত অন্যদিকে মুখ করে রেখেছে। আমি সোজা ওর দিকে তাকিয়ে থাকায় একসময় মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে। আর তক্ষুনি-

কিভাবে কি হল আমার পক্ষে বর্ননা করা কঠিন। হঠাৎ করেই আসিমভ হাত বাড়িয়ে ছো মারল আমার মাথার দিকে। আমি দ্রুত মাথা সরিয়ে সরে দাড়ালাম। কোনমতে টাল সামলে ঘুরে দাড়িয়ে দেখি আসিমভের মুঠোর মধ্যে মোচড় দিচ্ছে একটা সাপ। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল দেখে। সাপটা গাছ থেকে মাথা বাড়িয়েছিল আমার গলার কাছে। আমি বিন্দুমাত্র টের পাইনি।

সাপটা তার শরীর দিয়ে আসিমভের হাত পেচিয়ে ধরেছে। হাতখানেক লম্বা সাপ। আসিমভ বামহাত দিয়ে টেনে তাকে ছাড়াল। মাথাটা তখনো ডানহাতের মুঠোর মধ্যে। এরপর হাত ঘুরিয়ে সাপটাকে ছুড়ে মারল দুরের দিকে। একটা ঝোপের ওপর গিয়ে পরল সেটা। একমুহুর্ত তাকে দেখা গেল সেখানে, তারপরই নিচে ডালপালার মধ্যে হারিয়ে গেল।

আমি হতভম্ভ হয়ে তাকিয়ে থাকলাম ওর দিকে।

আসিমভ দুহাত একসাথে ঘসল। তারপর বলল, 'সন্ধ্যে হয়ে আসছে, এখন এখানে না থাকাই ভাল।'

বলে বাড়ির দিকে ঘুরল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমার মুখে কোন ভাষা যোগাচ্ছে না। আমি আর কথা না বাড়িয়ে রওনা দিলাম বাড়ির দিকে।

মনিরের বাড়িটা একচক্কর দেখে আমি থ হয়ে গেলাম। একেবারে বনের মধ্যে একা একটা বাড়ী অথচ আধুনিক বাড়ির সবকিছু রয়েছে। ইলেকট্রিক আলো, পানি, রান্নার গ্যাস। রান্নার গ্যাস আর জেনারেটরের তেল আনতে হয় বাইরে থেকে। তারপর সবকিছু চলে নিজে থেকেই। বিদ্যুত ব্যবহার হচ্ছে ব্যাটারী থেকে, সেটার শক্তি যোগাচ্ছে কখনো সোলার সেল, কখনো

জেনারেটর। ব্যাটারীর চার্জ শেষ হলে জেনারেটর নিজে থেকেই চালু হচ্ছে, ট্যাংকের পানি কমে গেলে মোটর চালু হচ্ছে, খাবার পানি পরিমানমত না থাকলে নিজেই ফিল্টার হচ্ছে। সত্যিই বিজ্ঞানীর বাড়ি। রান্নাবান্না, ধোয়ামোছার জন্য একটা রোবট থাকলে আরকিছু ভাবতে হত না।

রাতে খাবার টেবিলে বসে আমি বললাম, 'একজন কাজের মানুষ থাকলে বেশ হত। তোমাদের দুজনকে পালা করে রান্নাবান্নার কাজ করতে হত না।'

মনির বলল, 'একজন ছিল। ও না থাকায় একটু অসুবিধাই হচ্ছে। শফি বলেছে একজন বিশ্বাসী লোক দেবে। সেজন্য অপেক্ষায় আছি।'

শফি হচ্ছে আমাকে পৌছে দেয়া লোকটা। আমার শুধু রহমান অংশটাই মনে আছে। হয়ত শফিকুর রহমান জাতিয় কিছু, অথবা শফি ডাকনাম। মনেহয় কেনাকাটা থেকে শুরু করে বাইরের সব কাজ তাকে দিয়ে চলে। শুধু এখানে থাকে না এই যা। থাকলে ম্যানেজার বলা যেত।

জিজ্ঞেস করলাম, 'যদি কোন কারনে বাইরের সাথে যোগাযোগের সমস্যা হয় তখন ব্যবস্থা কি?'

মনির বলল, 'তেমন সমস্যা আজ পর্যন্ত হয়নি। বাইরের জিনিষপত্র ছাড়া কয়েকমাস চলার সামর্থ্য আমাদের আছে। শফি সপ্তাহে দুবার আসে। ওকে বলেছিলাম একবার আসলেও চলবে, তারপরও আসে। খোঁজখবর নিয়ে যায়। ওর বউ খাবার তৈরী করে পাঠায়। এই খাবারগুলো ওর বউ পাঠিয়েছে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'ও ফ্যামিলি নিয়ে আসে না?'

মনির অন্যমনস্কভাবে বলল, 'আসে। খুব কম। ওর ঝামেলার কাজ। দুজনেই চাকরী করে যেকারনে হিসেবে মেলে না। আসিমভকে ওরা খুব পছন্দ করে।'

আসমভ কোন কথা না বলে মাথা নিচু করে নিঃশব্দে খাচ্ছে। ওর কথা শুনে একবার মুখ তুলে তাকাল, তারপরই নিজের কাজে মনোনিবেশ করল।

আমি সাপের ঘটনাটা মনিরকে জানাইনি। দুর্ঘটনা যখন ঘটেনি তখন সেকথা বলে ওকে দুশ্চিন্তায় ফেলে কাজ কি। এমনিতেই ওর শারীরিক অবস্থা ভাল না। আমি যে কদিন আছি সে কদিন অন্তত নিশ্চিনে- থাকুক।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে বারান্দায় বসে কথাটা অন্যভাবে তুললাম। বললাম 'এমন যায়গায় সাপখোপ থাকার কথা।'

মনির হাল্কাভাবে বলল, 'এটা তো ওদেরই যায়গা। আমরাই এসে ওদের যায়গা দখল করেছি।'

আমি বললাম, 'সেতো বুঝলাম। দখল যখন হয়েই গেছে তখন আর কি করা। যদি ঘরে ঢুকে কামড়-টামড় দেয় কি মারাত্মক অবস্থা হবে। তোমার মনে আছে রশিদের কথা। ক্লাশ এইটে থাকতে সাপের কামড়ে মারা গিয়েছিল।'

মনির বলল, 'হ্যাঁ, মনে আছে।'

বলে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকল। আকাশে চাঁদ রয়েছে। যদিও এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। গাছপালারও ওপর সামান্য আলোর আভা। আকাশ পরিস্কার। হাসনাহেনার সুবাস বয়ে যাচ্ছে চারিদিকে। শুনেছি হাসনাহেনা, কামিনী এসব ফুল সাপকে আকৃষ্ট করে।

আমার মন থেকে সাপের বিষয়টা কিছুতেই যাচ্ছে না। বারবার আসিমভের হাতের মধ্যে সাপটার মোচড় খাওয়ার দৃশ্য ভেসে উঠছে। শুনেছি আহত সাপ খুব ভয়ংকর। যে আঘাত করেছে তাকে খুঁজে বের করে। প্রতিশোধ নেয়।

আমি আবার সেকথা তুললাম, 'ঘরে সাপ-টাপ ঢোকে না?'

মনির বলল, 'সাপ নিয়ে দুশ্চিন্তা কোর না। চারিদিকে কার্বলিক এসিড দেয়া আছে, এদিকে আসবে না। অকারনে আসবেই বা কেন? বাইরে খাবারের অভাব নেই।'

তারপরও আমার মন থেকে ভয় গেল না। আসিমভ খাবার পর দোতলায় ওর ঘরে চলে গেছে। বাড়িতে ঢোকার পর ওকে কোন কথা বলতে শুনিনি। মনে হচ্ছে ও মনিরের সাথে প্রায় কোন কথাই বলে না। নিঃশব্দে ওদের দুজনের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান হয়। দুজনেই বুঝে নেয় কার বক্তব্য কি।

আসিমভের ঘরের জানালা খোলা। জানালা দিয়ে ঘরের আলো গিয়ে পরেছে সামনের গাছে। আসিমভের ছায়া একবারের জন্যও দেখা যায়নি।

আমি বাড়িটা মোটামুটি দেখেছি। আমার থাকার ব্যবস্থা নিচতলায়, উত্তর দিকে। একটা ঘর বাদ দিয়ে মনিরের ঘর। মাঝখানের এই ঘরটা তালা দেয়া। আরো দুটো ঘর রয়েছে নিচে। আর রয়েছে রান্নাঘর, বাথরুম, ষ্টোররুম এইসব। ষ্টোররুম ভর্তি জিনিষপত্র। একটা সেলফ ভর্তি তৈরী খাবারের দেশি বিদেশী প্যাকেট আর টিন। ষ্টোররুমের পাশ থেকে একটা কাঠের সিড়ি উঠে গেছে দোতলায়। সেখানে আসিমভের শোবার ঘর, লাইব্রেরী এইসব। মনিরের সমস্যা হয় বলে ইদানিং সিড়ি বেয়ে ওঠেনা। সেকারনেই আমারও দোতলায় যাওয়া হয়নি।

আমার তেমন আগ্রহও নেই দোতলা সম্পর্কে। বরং আমার আগ্রহ মাটির নিচের ঘর নিয়ে। একটা বিশাল বন্ধ দরজার গায়ে একটুকরো কাগজ লাগানো, 'ল্যাবরেটরী।' মনির বলল ওটা তার কাজের যায়গা। ঘরটা মাটির নিচে। এই দরজা দিয়ে যেতে হয়। সারাদিন পরিশ্রম হয়েছে আজ থাক, একথা বলে ওদিকে নিয়ে যায়নি।

সেই পুরনো দিনের মত দুজন বসে থাকলাম চুপ করে। চারিদিকে অন্ধকার আর ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। বাতাসে গাছের নড়াচড়া। ফুলের গন্ধ। এছাড়া আর কিছু নেই। যে জগতে আমি এতগুলো বছর কাটিয়েছি সেই জগত এখান থেকে বহু দুরে।

বেশিক্ষন বসে থাকা হল না। যদিও বেশ গরম এরই মধ্যে মনির বলে বসল, ঠান্ডা লাগছে। এটাই ওর শরীরের অবস্থা, বুঝতে সময় লাগল না আমার। ওর ওষুধ থাওয়ার সময় হয়েছে। এভাবে বেশিক্ষন বসে থাকাও ওর জন্য ক্ষতিকর। আমি উঠে দাঁড়ালাম। আর তক্ষুনি আসিমভকে দেখলাম এগিয়ে আসতে।

কাউকেই কোন কথা বলতে হল না। মনিরকে ওর ঘরে রেখে নিজের ঘরে গেলাম। মনে মনে ঠিক করে রাখলাম, ওর দিকে চোখ রাখতে হবে। অসুস্থ্য মানুষ, কখন কোন প্রয়োজন হয় ঠিক নেই। আমি এখনও জানি না আসিমভ নিজের ঘরে রাত কাটাবে নাকি ওর কাছে থাকবে।

ঘরের আলো নিভিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। সত্যিই, সারাদিন এটা-ওটা করে গেছে। শরীর বলছে ঘুম প্রয়োজন। শোয়র সাথেসাথে বিদ্যুতের মত কি একটা বয়ে গেল মাথার মধ্যে। শরীর অবস হয়ে আসছে। আগে কখনো এভাবে ঘুম আসা টের পাইনি। দেখতে দেখতে চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

মাঝরাতে হঠাৎ করেই ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ খুলে প্রথমে মনে করতে পারলাম না আমি কোথায়। বামদিকে বিশাল একটা জানালা। জানালার পর্দাটা অর্ধেক টেনে দেয়া। বাইরের গাছপালা দেখা যাচ্ছে ওটা দিকে। চাদের আলোয় পরিস্কার দেখা যাচ্ছে গাছগুলোর মাথা। বাকি যায়গায় পর্দার ওপর একটা ছায়া। তাকিয়ে থাকতে একসময় বুঝতে পারলাম সেটা কি।

একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। পর্দার ওপর ছায়া পরেছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে ঘরের দিকে। আমার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। আমি তাকিয়ে আছি সেটা জানেনা। আমি রয়েছি পর্দার আড়ালে। সে তাকিয়ে আছে ঘরের খোলা দরজার দিকে। বাইরের আলো এসে পরেছে সেই দরজা দিয়ে।

আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে এল। এতটুকু নড়াচড়া না করে ভালভাবে দেখার চেষ্টা করলাম। ওটা কি আসলেই মানুষ? একটুও নড়ছে না। একবার মনে হল অন্যকিছুর ছায়া। মানুষ মনে করাটা আমার মনের ভূল।

তখনই ছাড়াটা নড়ে উঠল। মুহুর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল জানালা থেকে।

আমি তাকিয়েই থাকলাম। এতটুকু শব্দ নেই কোথাও। বাড়ির ভেতরেও না, বাইরেও না। বাইরের ঝিঝি পোকার ডাকও এখন নেই। বাতাস নেই। একেবারে নিস-ব্ধ, নিথর পরিবেশ।

ছায়াটা আর দেখা দিল না। বেশ কিছুক্ষন অপেক্ষা করে আমি উঠে বসলাম। গলা শুকিয়ে গেছে। দেখলাম বিছানার পাশেই টেবিলে একটা পানির বোতল।

কে রেখেছে ওটা? আমি নিশ্চিত আমি রাখিনি। শোবার সময় বোতলটা ওখানে ছিল না।

তাহলে?

নিশ্চয়ই আসিমভের কাজ। আমার পানি খাওয়া প্রয়োজন হতে পারে মনে করে রেখে গেছে। আশ্চর্য্য ছেলে।

পানি খেয়ে আমি কানপেতে শোনার চেষ্টা করলাম। কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। সাবধানে জানালার কাছি গিয়ে বাইরে উকি দিলাম। জানালায় মোটা লোহার গ্রীল বসানো। মানুষ কিংবা অন্য কোন প্রাণী যাই হোক না কেন, এদিক দিয়ে ঢুকতে পারবে না। বাইরের বারান্দাতেও এমন মোটা লোহার গ্রীল দেখেছি। তারমানে মনির জানে কেউ সে চেষ্টা করতে পারে।

জানালার বাইরের ধারেকাছে কোন গাছপালা নেই। বেশ কিছুটা যায়গা ফাঁকা। তারপর ছোটছোট ফুলগাছ। তারপর বাড়ির সীমানা ঘেরা মোটা কাঠের বেড়া। ধবধবে সাদা রঙ করা। বড় গাছগুলো তার বাইরে। গাছের নিচের দিকটা অন্ধকার।

যে কেউ ইচ্ছে করলেই বেড়া টপকে ভেতরে ঢুকতে পারবে। অনায়াসে হেঁটে আসতে পারবে জানালাম কাছে।

কাঁচের জানালা বন্ধ করে পর্দা টেনে দিলাম। বিছানায় শুয়ে সবকিছু একসাথে মেলানোর চেষ্টা করলাম। প্রথমেই মনে প্রশ্নটা এল, মনির এখানে এভাবে দিন কাটাচ্ছে কেন? কি করছে ও? একজন অসুস্থ মানুষ, সাথে একটা অল্প বয়সী ছেলে নিয়ে রয়েছে এমন একটা বাড়িতে। দেশে খারাপ মানুষের অভাব নেই। গরীব মানুষেরও অভাব নেই। অন্তত টাকাপয়সার লোভেও মানুষ এদিকে নজর দিতে পারে। সেটা কি জানে না?

ও অসুস্থ। ওর জরুরী চিকিৎসা প্রয়োজন। আমার অনুমান ইচ্ছে করলেই দেশে, দেশের বাইরে যে কোন যায়গায় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে। টাকাপয়সার সংকট নেই সেটা

অনুমান করতে পারি। ওর যা পরিচিতি তা ব্যবহার করলে যে কোন দেশে যেতে পারে। সেটা করছে না কেন?

আর যদি নিজের জীবন সম্পর্কে এতটাই বিতৃষ্ণা এসে থাকে, যদি ধরেই নেয় এভাবে নিজের বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে, তাহলে আসিমভের কি হবে? ওর পড়ালেখা প্রয়োজন, সমাজে থাকার প্রস্তুতি প্রয়োজন, মানুষের সঙ্গ প্রয়োজন। সেকথা কি মনির ভাবেনি?

মনের মধ্যে একটা সন্দেহ উকি দিতে শুরু করল। ও হয়ত চাইছে আমি আসিমভের দায়িত্ব নেই। আমাকে ও বিশ্বাস করে। জানে আমি তার দায়িত্ব নিতে পারব। আপন করে নিজের কাছে রাখতে পারব। আমার কাছে থাকলে আসিমভের চিন্তা থেকে সে নিজে মুক্ত হতে পারে। সেজন্যই ও চাইছে আমি এখানে কদিন থাকি। আসিমভের সাথে সম্পর্ক সহজ করি।

তারপর-

নিজের জন্য ওর পরিকল্পনা কি? কি করবে এসব কথা ও পরিস্কার করে বলছে না কেন? আমার সাথে ওর যতদিনের, যে পর্যায়ের সম্পর্ক তাতে আমাকে কোন কথা বলতে ওর কোন সংকোচ থাকা উচিত না।

বাকিরাত ভাল করে ঘুম হল না। ভাঙা ভাঙা স্বপ্ন আর চিন্তা তালগোল পাকিয়ে গেল। বারবার মনে হতে লাগল আমার ছোটবেলার চেনা সেই মনির যেন আর নেই। তখন মনিরকে আমি ভালভাবে চিনতাম, বুঝতাম। এখন তাকে আমি বুঝতে পারছি না। কেমন যেন অস্পষ্ট, রহস্যময় একটা চরিত্র হয়ে উপসি'ত হয়েছে আমার সামনে।

সকালে ঘুম ভাঙতে প্রথমেই চোখ গেল জানালার বাইরে। পর্দার ওপর দিয়েই দেখা যাচ্ছে গাছের গায়ে হলুদ রোদ চকচক করছে। গরম ছড়াতে শুরু করেছে এরই মধ্যে। ঘরে ফ্যান নেই। নিজেই জানালা বন্ধ করে হাওয়া আসার পথ বন্ধ করেছি। আমার গা ঘেমে উঠেছে। ডানদিকে তাকিয়ে দেখলাম। সেখানে বড় একটা দেয়াল ঘড়ি। আটটা বিশ বাজে।

লাফিয়ে উঠে বসলাম। এখন সুর্য ওঠে পাঁচটারও আগে। তারমানে বহু সময় ঘুমিয়েছি। নিজের বাড়িতে এটা কোন বিষয় না কিন্তু আমি এসেছি অন্যের বাড়ি। এখানে এটা মানায় না।

ব্রাসে টুথপেষ্ট লাগিয়ে মুখে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখলাম টেবিলে খাবার রেখে মনির আর আসিমভ বসে রয়েছে। দুজনের হাতে দুটো পত্রিকা। আমাকে দেখে দুজনেই ঘুরে তাকাল। আসিমভের হাতের পত্রিকার সামনের দিক দেখা যাচ্ছে। ন্যাচার। গতকাল শফি নামের লোকটা যে প্যাকেটগুলো দিয়ে গেছে তারসাথে ছিল।

মনির বলল, 'ভাল ঘুম হয়নি বোধহয়?'

আমি বিষয়টাকে সহজ করার চেষ্টা করলাম, 'নতুন যায়গায় এমন হয়।'

দেরী না করে দ্রুত হাতমুখ ধুয়ে এসে খাবার টেবিলে বসলাম। অধিকাংশ দোকানের তৈরী খাবার। শুধু ডিমভাজাটা একেবারে টাটকা। এখনো গরম রয়েছে। পাউরুটির টুকরোগুলো গরম করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আসিমভ করেছে। মেঝেতে এখানে সেখানে পানি দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত একবার ধোয়ামোছা হয়ে গেছে। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করে ছেলেটা।

'এখানে খাবার-দাবারের অবস্থা কি?' খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম।

মনির বলল, ‘কিভাবে বিচার করবে তার ওপর নির্ভর করে। যদি মাছ খেতে চাও মাছের অভাব নেই। খুব সস্তায় প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। আসিমভের সাথে গিয়ে কিনে আনতে হবে। তবে রাঁধতে হবে নিজেকে। সাক-সব্জী অফুরন্ত। নিজেদের গাছে আম-কাঠালও আছে। কিছুদিন পর জাম পাকবে।’

আমি আসিমভের দিকে একবার তাকিয়ে বললাম, ‘হুঁ। বয়সটা আসিমভের সমান হলে তবে না মানাত। পাকা জামের মধুর রসে রঙিন করি মুখ। তুমি জানো কবিতাটা?’

আসিমভ সংক্ষেপে কিন্তু স্পষ্টভাবে বলল, ‘জ্বি।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘গাছে উঠতে পার?’

আসিমভ এবার উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে হাসতে থাকল। মনিরের দিকে তাকিয়ে দেখি সেও হাসছে।

এটা নিশ্চয়ই বোকার মত প্রশ্ন। এই পরিবেশে থেকে গাছে উঠতে পারবে না সেটা হয় না। এটা পদ্মাপাড়ের ছেলেকে সাঁতার জানার প্রশ্নের সামিল।

আমি বললাম, ‘গাছে ওঠায় আমি সবসময় মনিরের চেয়ে এগিয়ে ছিলাম। অবশ্য ঢিল ছোড়ায় মনিরের তুলনা ছিল না।’

মনির বলল, ‘যাচাই করে দেখ গাছে ওঠার দক্ষতা এখনো আছে কি-না। ওপাশের গাছে অনেক পাকা আম আছে। খুব ভাল না হলেও খাওয়া চলে। ভালমত ফলভোজন হবে।’

আমি চ্যালেঞ্জটা নিয়ে বললাম, ‘ঠিক আছে।’

রাতে একজন লোককে জানালা দিয়ে উকি মারতে দেখেছি, কথাটা মনে পরছে বারবার। মনিরকে কথাটা জানানো দরকার। এভাবে যে রাতের বেলা পরের ঘরে উকি দেয় তাকে ভালমানুষ মনে করার কোন কারন নেই। আর অন্য কোন বাড়ি কিংবা মানুষ যখন আসেপাশে নেই।

রাতে মনের মধ্যে একধরনের ভয় কাজ করছিল সেটা অবশ্য এখন নেই। কোন মানুষ যদি হয়ও, দিনের বেলা তার সামনাসামনি দাঁড়ানোর মত কিছুটা সাহস অন্তত আছে। জীবনে কখনো হাতাহাতি করিনি এমন তো-না। বরং একেবারে সাধারন মানুষের চেয়ে আমার দক্ষতা কিছু বেশিই হবে।

রাতের লোকের বিষয়টা আসিমভকে না নাজানোই ভাল।

এখানে প্রতিদিনের খবরের কাগজের ব্যবস্থা নেই। খাবার পর বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে গতকালের কাগজে চোখ বুলানোর সময় কথাটা পাড়লাম অন্যভাবে, ‘তোমাদের এখারে চোরের ভয় নেই।’

মনির কথাটাকে গুরুত্ব দিল না। সে উলোটা প্রশ্ন করল, ‘কি চুরি করবে?’

আমি বললাম, ‘কি চুরি করবে সেটা চোরের চিন্তা। সে যা পায় তাই লাভ।’

মনির বলল, ‘কে চুরি করবে?’

মনে হল আমার সরাসরি বলাই উচিত গতরাতে একজনকে জানালায় উকি মারতে দেখেছি। ওর স্বাসে'্যর কথা ভেবে বলতে বাধল। বললাম, ‘দেশে খারাপ মানুষের কি অভাব আছে? সামান্য লাভের জন্য মানুষ অনেক খারাপ কাজ করতে পারে। যদি টের পায় তোমরা দুজন এখানে একা থাকো তাহলে ডাকাতির চেষ্টাও করতে পারে।’

মনির বলল, ‘তুমি যত সহজ ভাবছ বিষয়টা তত সহজ না। দরজা-জানালা বন্ধ রাখলে কেউ ঢুকতে পারবে না। এই জানালার কাঁচগুলো বুলেটপ্রুফ।’

তারমানে তেমন কিছু হতে পারে জেনেই বাড়ি তৈরী করা হয়েছে। আমি তারমত নির্ভার হতে পারলাম না। গতরাতে নিজের চোখে যখন দেখেছি।

আমি বললাম, ‘তাহলেও, যদি কেউ সেই চেষ্টা করে?’

মনির বলল, ‘তুমি শুধুশুধু চিন্তা করছ। আসেপাশের কয়েক মাইলের মধ্যে যারা থাকে সবাই এই বাড়ি সম্পর্কে জানে। জানে সে চেষ্টা করা মানে নিজের বিপদ ডেকে আনা। এখানে সিকিউরিটির কিছু ব্যবস্থা আছে।’

আমার কথা কোন গুরুত্বই পাচ্ছে না। আমি আরেকটু সরাসরি বলার চেষ্টা করলাম, ‘রাতের বেলা কেউ বেড়া টপকে এসে যদি জানালায় উকি মারে সেটা কি অসম্ভব?’

মনির একটু সময় নিল উত্তর দিতে। তারপর বলল, ‘অসম্ভব না। তবে অস্বাভাবিক। আর বিপদজনক। বাইরের যে কাঠের বেড়াটা দেখছ ওটাতে কাঠ-লোহা দুইই আছে। ইচ্ছে করলে চারশ ভোল্ট বিদ্যুৎ দেয়া যায়। সবসময় দিয়ে রাখি না তাতে ছোটখাট প্রাণী মারা যায়। বাড়ির দরজা-জানালায়ও সেটা করা যায়। জানালার ভেতরদিকে দেখবে লাল সিগন্যাল দেয়া আছে। ওটা অন অবস্থায় জানালায় হাত দিও না। পাশের সুইচ দিয়ে অফ করা যায়।’

আমি কিছুটা ভরসা পেলাম এতক্ষনে। একেবারে নিশ্চিনে- সে বসবাস করছে না তাহলে।

জিজ্ঞেস করলাম, ‘তোমার শরীরের অবস্থা কেমন?’

মনির বলল, ‘মোটামুটি। তুমি আসায় ভাল লাগছে।’

সকালের নাস্তার পরই আসিমভ বাইরে কোথাও গেছে। আমি লক্ষ্য করেছি মনিরের সাথে ওর কথাবার্তা হয় একেবারেই কম। সেটা আমার উপসি'তির কারনে কিনা বুঝতে পারছি না।

আমি বললাম, ‘তোমার ল্যাবরেটরীটা দেখব একসময়।’

মনির উঠে দাঁড়াল তখনই, ‘চল, এখনই ঘুরে আসি।’

আমার ধারনা ছিল দরজাটা তালা দেয়া। তারপরই মনে হল, তালা দেবে কার জন্য?

দরজার পাশে একটা লিভার চাপ দিতে বিশাল দরজাটা মাঝখান থেকে ভাগ হয়ে দুপাশে সরে গেল। বারান্দার মত যায়গাটা এগিয়ে গেছে কিছুদুর। তারপর সিড়ি। প্রথমে সোজা সামনের দিকে গেছে কিছুদুর, তারপর ডানদিকে ঘুরে গেছে। সিড়ি দিয়ে নেমে বিশাল একটা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালাম।

প্রথমেই আমার চোখে পড়ল সুর্যের আলো। ছাদের গা ঘেঁসে পাশাপাশি তিনটা কাঁচের জানালা। সুর্যের আলো ঢুকছে সেদিক দিয়ে। নিশ্চয়ই আলো পাবার জন্য। মনির আরো কয়েকটা আলো জ্বেলে দিল। আমি চারিদিকে একবার চোখ বোলালাম।

প্রায় চারিদিকেই দেয়াল ঘেঁসে বড়বড় যন্ত্র বসানো। আমার মাথায় ঢুকল না সেগুলো কি কাজে ব্যবহার হয়। একটাতে বড় একটা টেপ চড়ানো। কিছু একটা রেকর্ড হয় ওতে। এখন থেমে রয়েছে। কয়েকটা মনিটরের মত ডিসপ্লে। একটা সাধারন কম্পিউটার। সেটা ঘরের মাঝামাঝি যায়গায় টেবিলে রাখা। টেবিলে বেশকিছু কাগজপত্র। একবার দৃষ্টি বুলিয়ে মনে হল প্রোগ্রামিংএর কোড। বড়বড় ফর্মূলা লেখা। কলম দিয়ে লেখা, সেখানে বিভিন্ন যায়গায় কাটাকুটি

করেছে। নতুনভাবে পাশে ছোটছোট অক্ষরে লিখেছে। একদিকে সেলফে অনেকগুলো মোটামোটা বই।

আমার মাথায় কিছুই ঢুকল না। এই ল্যাবরেটরীতে কি কাজ করে সে?

মনির ঘরে ঢুকে কালো রঙের একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে। আমি দেখা শেষ করে ওর পাশে গিয়ে বসলাম।

এই ল্যাবরেটরী তৈরী করতে প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু টাকা তারজন্য সমস্যা না সেটা আমি জানি। আমাকে তারচেয়েও অবাক করেছে এটা তৈরী করার দক্ষতা। বেশকিছু দক্ষ লোক প্রয়োজন হয়েছে। অনেক সময় ব্যয় করতে হয়েছে। সে এসব বিষয়ে খুব খুঁতখুঁতে। একেবারে নিজের পছন্দমত না হওয়া পর্যন্ত কখনো সন্তুষ্ট হয় না। ঘরের সবকিছু নিশ্চয়ই তার হিসেবমত তৈরী। আর ওই বড়বড় যন্ত্রগুলো। বাড়ি তৈরীর পর ওগুলো ঢুকিয়েছে না ঢুকিয়ে তারপর বাড়ি তৈরী করেছে আমার মাথায় ঢুকল না।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন কি কাজ বন্ধ?'

মনির চোখ খুলল। বলল, 'শরীরের অবস্থা তেমন ভাল না। আর কি করব সেটাও ঠিক করতে পারছি না। আজকাল কিছু করতে উৎসাহ পাই না। কখনো কখনো মনে হয় বৃথা সময় নষ্ট করছি।'

আমি তার কথা বুঝলাম না। স্কুলে রচনা লিখেছি বিজ্ঞান সুফল না কুফল। মনেহল তেমন কিছু বলছে। ওর পরের কথাতে সেটা নিশ্চিত হয়ে গেলাম।

'কখনো মনেহয় মানুষ প্রকৃতির সাথে মিশে থাকলে ভাল হত। প্রকৃতির মত বেড়ে ওঠ তারপর একদিন নতুনের জন্য যায়গা করে দাও। এটাই নিয়ম হলে ভাল হত।'

আমার একবার তর্ক করতে ইচ্ছে হল। মানুষ কত ভাল কিছুই না আবিস্কার করেছে। না করলে এই বিপুল সংখ্যক মানুষ এই ছোট্ট পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারত না। খারাপ কাজ হয়েছে, হচ্ছে এটা তো ঠিক। কিন্তু ভাল কাজও তো হচ্ছে।

আমি বললাম, 'কেউ ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে অস্ত্র তৈরী করে, কেউ খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে সেটা ব্যবহার করে। যে তৈরী করেছে দোষ কি তাকে দেবে?'

মনির বলল, 'আফ্রিকায় প্রতি মিনিটে দুজন শিশু ম্যালেরিয়ায় মারা যায় সেটা জান?'

একেবারে সঠিক পরিসংখ্যান না জানলেও কিছুটা ধারনা তো আছেই। বললাম, 'ওরা দরিদ্র। না খেয়েও অনেকে মারা যায়।'

মনির বলল, 'পৃথিবী দরিদ্র না। পৃথিবীর যা সম্পদ তা ঠিকভাবে ভাগ করলে একজনও না খেয়ে থাকত না। ম্যালেরিয়া এমন রোগ না যে মানুষকে মরতে হবে। এ রোগ থেকে মানুষকে বাঁচানো যায়। সবসময়ই অস্ত্রের কথা বলে, যুদ্ধের কথা বলে এই বিষয়টাকে আড়াল করে রাখা হয়।'

এই বিতর্ক আমি অনেক শুনেছি। বহু বছর ধরেই মানুষ এ নিয়ে কথা বলছে, লাভ হয়নি কিছুই। তাদের বাঁচানো হয়নি, যুদ্ধ থামেনি। বরং বেড়েছে। আমেরিকার তৈরী অস্ত্র দিয়ে মানুষ আমেরিকানদের মারছে। ইরাক, আফগানিস্তান, সোমালিয়া, সুদান অস্ত্র তৈরী করে না। অস্ত্রব্যবসা করে না। এ আর নতুন কি। আমি সেকথা ভেবেই বা কি করব।

মনির এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন?

আমার মনে হল এখান থেকে বাইরে যাওয়া প্রয়োজন। এখানে থাকলে ওর মাথায় এই বিষয় ঘুরপাক খাবে।

আমি বললাম, 'আসিমভ এসেছে কিনা দেখা দরকার।'

মনির আপত্তি করল না তাতে। উঠে দাঁড়িয়ে হেসে জিজ্ঞেস করল, 'দেখা হয়েছে?'

আমিও হেঁসে উত্তর দিলাম, 'দেখেছি। বুঝিনি কিছুই।'

আসিমভ তখনো ফেরেনি। আমরা বারান্দা বসার কিছুক্ষন পর ফিরল। ও যখন বাইরে যায় তখন আমি বাথরুমে ছিলাম। কিভাবে গেছে দেখিনি। ওকে ফিরতে দেখে অবাক হলাম। মনিরের জিপটা চালিয়ে এসে গেটের বাইরে থামল।

আমি অবাক হয়ে মনিরের দিকে ফিরলাম, 'অতটুকু ছেলে গাড়ি চালায়?'

মনির বলল, 'পথে অন্য গাড়ি যখন নেই তখন একসিডেন্টের সম্ভাবনা কম।'

কথাটা ঠিক। আমি সাইকেল চালাতে পারি শুধুমাত্র গ্রামের রাস্তায়, কিংবা মাঠে। শহরের রাস্তায় চালাতে সাহস হয় না। নিশ্চিত জানি কারো সাথে ধাক্কা লাগবে।

আসিমভ একটা এল্যুমিনিয়ামের পাত্র হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল। দেখেই বোঝা যায় দুধের পাত্র। আমি প্রশ্ন করার আগেই ব্যাখ্যা দিল মনির, 'ওপাশের গ্রাম থেকে দুধ আনতে হয়।'

আমি কিছু বললাম না।

আসিমভ কারো সাথে কথা না বলে পাত্রটা নিয়ে ভেতরে চলে গেল। এর স্বভাব অনেকটাই মনিরের মত। মনিরকে কখনো কাজের কথা বলে দিতে হত না।

আমি মনিরের জিপটা দেখলাম। গতকাল ওটা পাশের ছোট ছাদের নিচে রাখা ছিল। বেশ পুরনো গাড়ি তবে এই যায়গার জন্য মানানসই। উচুনিচু রাস্তায় অনায়াসে চলতে পারবে।

আসিমভের দেরী দেখে অনুমান করলাম দুধ গরম করছে। সত্যিই তাই। একটুপর আমাদের দুজনের জন্য দুগ্লাশ দুধ একটা ট্রেতে করে এনে হাজির করল।

মনিরের জন্য এটা প্রয়োজন, আমার জন্য কতটা ভেবে পেলাম না। বহুকাল এভাবে দুধ খেয়ে অভ্যেস নেই। ভেজাল ছাড়া দুধ পাওয়া যায় একথা ঢাকা শহরে কেউ বিশ্বাস করে বলে মনে হয় না। আজকাল নাকি ফরমালিন দিয়ে দুধ টাটকা রাখে। সেই দুধ খেয়ে শিশু কিংবা অসুস্থদের কি হয় ভেবে আতকে উঠি।

মনিরের কথাই হয়ত ঠিক। বিজ্ঞানের এত উন্নতির হয়ত প্রয়োজন ছিল না। আমরা প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছি। আরো কিছুটা প্রকৃতির কাছাকাছি থাকতে পারলে ভাল হত।

মনির দুধ খেতে খেতে বলল, 'তোমার আশপাশটা দেখা হয়নি। ওর সাথে গাড়িতে গিয়ে একটু ধারনা নিয়ে এস।'

আমারও সেটাই ইচ্ছে। হেঁটে চারিদিক দেখব তো বটেই, তার আগে আরো বিসতৃত এলাকা সম্পর্কে একটু ধারনা থাকা ভাল। আর আমার জানা দরকার এমন দুরত্বে কেউ থাকে কিনা যে রাতে এসে জানালায় উকি দিতে পারে। আমি নিশ্চিত রাতে আমি ভূল দেখিনি।

আসিমভ গাড়ি চালানোয় অত্যন্ত দক্ষ। সে গাড়ির মুখ ঘোরানোর চেষ্টা করল না। গাড়িটা ব্যাকগিয়ারে মুল রাস্তায় নিয়ে ফেলল। তারপর আমি যেপথে এসেছিলাম তার বিপরীত দিকে রওনা হল।

একেই মুল রাস্তা বলতে হয়। আসলে রাস্তা বলতে দুপাশ থেকে কিছুটা উচু ফুটছয়েক চওড়া যায়গা। হয়ত কখনো মাটি ফেলে রাস্তা বানানো হয়েছিল। ইট-খোয়া-পাথর-সিমেন্ট-পিচ কিছুই দেয়া হয়নি। এখানে সেখানে উচুনিচু হয়ে গেছে, ঘাস গজিয়েছে সব যায়গায়। পুরনো মডেলের ল্যান্ড রোভারটা উচুনিচু পথে টক্কর খেতে খেতে চলল। একটুতেই আমি হাফিয়ে গেলাম। বুঝতে পারছি কিছুক্ষন এই রাস্তায় চললে আমার সারা শরীর ঝনঝন করবে। ঢাকা শহরের ভাঙাচোরা রাস্তা নিয়ে সবসময় অভিযোগ করেই অভ্যস্ত। এখন মনে হচ্ছে সেটা এর তুলনায় স্বর্গ।

রাস্তা দেখে বুঝতে পারছি বহুদিন এদিকে কারো পা পড়েনি। তারমানে আসিমভ দুধ আনতে এদিকে আসেনি। আমি যে রাস্তা দিয়ে এসেছি সেই রাস্তা দিয়ে গেছে। যতদুর মনে পরে আসার সময় কয়েক মাইলের মধ্যে আমি কোন ঘরবাড়ি দেখিনি। অন্তত দুধ বিক্রি করতে পারে এমন লোকালয়।

এরই মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটল। রাস্তার ওপর ছোট কয়েকটা প্রাণী দেখলাম। পরিস্কার না দেখলেও বুঝলাম খরগোস। কয়েকটা লাফিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পাশের ঝোপে। একটা রাস্তা থেকে সরে যাওয়া প্রয়োজন মনে করেনি। গাড়ির গতি তখন এতটাই বেশি যে ব্রেক করলেও তার গায়ে ওঠার সম্ভাবনা। আসিমভ গতি বাড়িয়ে রাস্তার নিচ দিয়ে পেরিয়ে যেতে চেষ্টা করল। কিন্তু কপাল মন্দ হলে এমনই হয়। জোরে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে পিছনের চাকা ঘাসে ঢাকা গর্তে আটকে বনবন করে ঘুরতে থাকল।

আমি মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম খরগোসটা তখনো রাস্তার মধ্যে। কান খাড়া করে তাকিয়ে আছে। এতক্ষন গাড়ি দেখে ভয় পায়নি, এবার আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে তড়াক করে লাফ দিল। মুহুর্তে ঝোপের আড়ালে চলে গেল।

আসিমভ আরেকবার চেষ্টা করল সামনে যেতে। গাড়ি নড়াচড়া করল না। উপায় নেই দেখে নামতে হল।

আসিমভ ঘুরে গিয়ে পিছনের চাকা দেখল। সামনের চাকা গর্তটা পেরিয়ে গেছে। আটকে গেছে পিছনের চাকা। শুধু গর্ত হলেও এতটা সমস্যা হত না, বৃষ্টিতে ভিজে, পানি জমে কাদা হয়ে রয়েছে। সেকারনে পেরোতে পারেনি।

এই অবস্থায় কি করা যায়? শুরুতেই আমার মাথায় এল ধাক্কা দেয়ার কথা। ধাক্কা দিয়ে গর্তটা পার করতে হবে। দুজনে মিলে কি সেটা করা সম্ভব? শুধু ধাক্কায় কাজ হবে না। রীতিমত উচু করে গর্ত পার করতে হবে।

আশেপাশে তাকিয়ে দেখলাম। বেশ কয়েক মিনিট গাড়িতে এসেছি আমরা অথচ একজন মানুষও চোখে পরেনি। যদিও রাস্তা থেকে একটু দুরেই ধানখেত দেখেছি। উচুনিচু যায়গার মধ্যে মধ্যে একফালি করে সমান জমি। সেখানে ধান লাগানো। ধান গাছগুলো মাঝারি আকারের। সম্ভবত সেকারনেই দেখা প্রয়োজন হয় না। একজন দুজন লোক পেলে অনায়াসে ধাক্কা দেয়ার কাজটা করে নেয়া যেত।

চারিদিকে দেখে কোন মানুষ পাওয়ার সম্ভাবনা বাদ দিতে হল। যা করার নিজেদের বুদ্ধিতে করতে হবে।

অনেককে দেখেছি এমন অবস্থায় চাকার নিচে কিছু গুজে দিতে। শক্ত যায়গা পেলে চাকা সেটা ব্যবহার করতে পারবে। সেটা কি হবে পারে? ধারেকাছে ইট জাতিয় কিছু নেই। মাটির ঢেলা পর্যন্ত নেই। মাটি কাটতে হলেও কিছু একটা হাতিয়ার প্রয়োজন। আমাদের কাছে কিছুই নেই। অথবা লিভার জাতিয় কিছু। কিন্তু গাছের ডাল কাটতেও যন্ত্র প্রয়োজন। পেশিশক্তিই এখানে একমাত্র ভরসা।

আসিমভকে বললাম, 'মনে হচ্ছে ধাক্কা দিয়ে তুলতে হবে।'

মনে হল আসিমভের সেটাই ধারনা। সার্টের আসি-ন গুটিয়ে প্রস্তুতি নিলাম। তারপর দুজন একসাথে পিছন থেকে ধাক্কা মারলাম। গাড়িটা সামান্য কেঁপে উঠল শুধু।

এক ধাক্কাতেই বুঝে গেছি কাজ হবে না।

আমি হাল ছেড়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আসিমভ দাঁড়িয়ে থাকল সেখানেই। তারপর বলল, 'আপনি ওপাশে দাঁড়ান, আমি দেখছি।'

আমি একপাশে সরে দাঁড়ালাম। আসিমভ আবারও ধাক্কা দেয়ার প্রস্তুতি নিল। আমার হাসি পেল দেখে। দুজন মিলে গাড়িটা নড়াতে পারিনি, সে একাই গাড়ি উঠিয়ে ফেলবে। এর আত্মবিশ্বাস অত্যন্ত বেশি। মনে মনে বললাম, দেখ বাবা চেষ্টা করে। অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে হয়।

আসিমভ চাকার কাছে যায়গাটা দেখল ভাল করে। ধরার মত একটা যায়গা খুঁজল। তারপর গাড়ি থেকে একটুকরো কাপড় নিয়ে সেটা হাতে জড়িয়ে গাড়ির পিছনদিকটা ধরল। নিচু হয়ে বসে গাড়িটা উচু করতে চেষ্টা করল।

আমি মুখে হাসি নিয়ে ওর কান্ড কারখানা দেখতে লাগলাম। আসিমভ একবার শক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কি হতে পারে। তারপরই সর্বশক্তি দিয়ে গাড়িটা ওঠানোর চেষ্টা করল। আমাকে হতভম্ভ করে দিয়ে গাড়িটা উচু হল একটু। তারপর আরেকটু। তারপর উচু করে ধাক্কা মারল সামনের দিকে। গাড়িটা গড়িয়ে গেল সামনের দিকে।

আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না। এক মুহূর্ত আগে দুজন চেষ্টা করে গাড়িটা সরাতে পারিনি। আর আসিমভ একা গাড়িটা উচু করে গর্ত পার করে দিয়েছে।

দুহাত দুপাশে ঝুলিয়ে দিয়ে ঝাকাচ্ছে আসিমভ। নিশ্চয়ই ব্যথা পেয়েছে। একটু পরই সামলে নিল সেটা। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, 'আমারই ভূল হয়েছে। আগে থেকে সাবধানে চালালে এমন হত না।'

আমি কি বলব ভেবে পেলাম না। তার যায়গায় আমি থাকলে হয় খরগোসটাকে চাকার নিচে পিষে ফেলতাম, নয়ত গাড়ির আরো কাহিল অবস্থা হত। নির্ঘাত গাছের গায়ে ধাক্কা মারতাম।

এখন কি আরো সামনের দিকে যাব, নাকি ফেরত যাব ভাবতে থাকলাম। আসিমভের কি ইচ্ছে। ও নিশ্চয়ই আরো সামনে যেতে চায়। আমাকে চারিদিক দেখানোর দায়িত্ব নিয়ে সে বের হয়েছে। নিজের কাজ শেষ হয়েছে মনে করছে না নিশ্চয়ই।

আসিমভ বলল, 'বৃষ্টি আসছে।'

ওর দৃষ্টি অনুসরন করে আমি দেখলাম দুরের গাছপালা সাদা কুয়াসায় ঢেকে গেছে। একটু পরই বুঝতে পারলাম সাদা কুয়াসা এগিয়ে আসছে এগিকে। যত এগিয়ে আসছে ততই গাছপালা ঝাপসা হয়ে আসছে।

আসিমভ দ্রুত গাড়িতে উঠে বসে ষ্টার্ট দিল। রাস্তায় উঠানো পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম। আসিমভ গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়িমুখো করল। আমি উঠে বসায় রওনা হল।

দেখতে দেখতে বৃষ্টি এসে গেল। কোন শব্দ নেই। শুধুই ঝিরঝির করে পানি পড়ছে। এরই মধ্যে চলেছে আমাদের গাড়ি। এবারে আসিমভ অনেক সাবধানি। একেবারে আসে- আসে- গাড়ি চালাচ্ছে। বৃষ্টিতে রাস্তা এরই মধ্যে ভিজে গেছে। খুব সহজেই পিছলে রাস্তার পাশে চলে যেতে পারে।

কোনরকম নতুন ঝামেলা ছাড়াই আমরা বাড়ির কাছে এসে পড়লাম। মনির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টি দেখে নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছে আমরা এখনই ফিরব। আসিমভ গাড়িটা বাইরেই রাখল।

গাড়ি থেকে নেমে বারান্দায় গিয়ে উঠলাম। বৃষ্টিতে ভিজতে আমার খারাপ লাগে না। সবসময়ই আমি খুব পছন্দ করি। এত বেশি ভিজেছি যে বৃষ্টিতে ভিজে কোন সমস্যা হবে সেকথা মনেই হয় না। এখানে যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে তাকে তুষারের সাথে তুলনা করা চলে। শরীরে লাগলেও যেন শরীর ভিজবে না।

শরীরে-মাথায় যেটুকু পানি লেগেছিল সেটা মুছে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতে থাকলাম। এমন মনোরম দৃশ্য দেখার সুযোগ বহুদিন পাইনি। চারিদিকে বড়ছোট গাছ। তার ওপর দিয়ে ঝিরঝির করে বৃষ্টির পানি ঝরে চলেছে। আকাশ এখনো পরিস্কার। চারিদিকে ঝকঝকে আলো। এভাবে বৃষ্টি হওয়ার অর্থই রঙধনু তৈরী হওয়া। ডানদিকে তাকাতেই সেটা দেখতে পেলাম।

ঘন্টাখানেক ধরে অনবরত বৃষ্টি ঝরেই চলেছে। থামার কোন লক্ষন নেই। বরং সেটা আরো দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হচ্ছে। কালো মেঘ এসে ভিড় করেছে। দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে গেল চারিদিক। এতক্ষন বাতাস ছিল না, এবার সেটাও শুরু হল। একে ঝড় বলা চলে না তবে দমকা হাওয়া বইছে। বাতাস শীষ দিয়ে যাচ্ছে। দরজা জানালা এটে দিয়ে ঘরে ঢুকতে হল।

এখনও আমি দোতলায় যাইনি। এবার সে সুযোগ হল। আসিমভের সাথে সিড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলাম।

দোতলায় ঘর নিচতলার চেয়ে অনেক কম। তবে খোলা বারান্দা নেই কোনদিকেই। প্রথমেই আসিমভের ঘরে ঢুকলাম।

ধারনা ছিল ঢুকেই আসিমভ সম্পর্কে আরো কিছু জানার সুযোগ পাব। এই বয়সী ছেলের ঘর তারা তাদের মনের মত করে রাখতে চায়। শখের জিনিষপত্র, প্রিয় খেলোয়ার কি গায়কের-নায়কের ছবি এসব ঝুলানো থাকে। ছোটবেলায় মনিরের ঘরেও দেখেছি। আসিমভের ঘর দেখে বোঝার উপায় নেই এটা এই বয়সী ছেলের ঘর। দেয়ালে কোন ছবি নেই, শখের কোন জিনিষ নেই। একদিকে ছোট একটা বিছানা। কয়েকটা সেলফ। একটা কম্পিউটার টেবিল। সেখানে

একটা নোটবুক কম্পিউটার। টেবিলে একটামাত্র ছবি, সেটা মনিরের। এখানেই কোথাও উঠানো। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সেলফের বইগুলো একবার তাকিয়ে দেখলাম। নিশ্চয়ই মনিরের বই। নানাধরনের বিজ্ঞানের বই, আর্টের বই, ফটোগ্রাফির বই। অনেকগুলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইও দেখলাম। গ্রে-র এনাটমি থেকে শুরু করে মলিকুলার বায়োলজি পর্যন্ত। এগুলো কে পড়ে বুঝলাম না। আমি ফটোগ্রাফির একটা বই উঠিয়ে নিলাম। ব্রায়ান পিটারসনের সামপ্রতিক সময়ের বই। পাতা উল্টাতে সুর্যমুখির বাগানের ছবি বের হল। অনেকগুলো ফুলের মধ্যে একটা মেয়ে দুহাত উচু করে দাঁড়িয়ে। বইটা হাতে নিয়ে আসিমভের পাশে বসলাম।

আসিমভ কম্পিউটারটা টেনে নিয়ে চালু করল। মুখে বলল, 'এখানে অনেক ছবি আছে।'

এই প্রথম আসিমভ নিজে থেকে কোন বিষয়ে কথা বলল।

আমি বইটা রেখে তার উঠানো ছবি দেখতে শুরু করলাম। নিশ্চয়ই মনিরের সাথে থেকে হাত পাকিয়েছে। কম্পোজিশনের বোধ চমৎকার। গাছ, পাতা, ফুল, মাকড়সা, প্রজাপতি, পাখি। বেশিরভাগই ক্লোজআপ ছবি। কয়েকশত ছবির মধ্যে মানুষের দেখা পেলাম মাত্র কয়েকজন। তাদের একজনকে আমি চিনি। শফি। সাথের মহিলা নিশ্চয়ই তার স্ত্রী। বছরদুয়েক বয়সের একটি সন্তান। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাততালি দিচ্ছে। আরেকজনকে চিনতে পারলাম না।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কে?'

আসিমভ বলল, 'এখানে কাজ করত।'

এরকথা আগেও শুনেছি মনিরের কাছে। বেঁটে, মোটা। পড়নের চেক লুঙ্গি। মাথায় সামনের দিকে টাক। মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। দেখে বাড়িতে কাজ করার মানুষ বলেই মনে হয়।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার ছবি একটাও দেখছি না।'

আসিমভ বলল, 'আমার ছবি এখানে নেই। এগুলো আমি উঠিয়েছি।'

তাতো বটেই। নিজের উঠানো ছবিতে নিজে থাকার সম্ভাবনা কম। মনে হচ্ছে আসিমভের আগ্রহও কম। এখনকার ক্যামেরায় নিজেই নিজের ছবি উঠানো যায়। তাছাড়া ওর ক্যামেরা ষ্ট্যান্ড আছে নিশ্চয়ই।

আমি যত দেখছি তত অবাক হচ্ছি আসমভের সবকিছুতে। কোথাও যেন কিছু একটা গড়মিল থেকে যাচ্ছে। আমার মাথায় আসি আসি করেও আসছে না। কিছু একটা যেন ঠিক মানানসই না। ওর কথাবার্ত, আচরন, কাজ সবকিছুতেই কেমন যেন একটা না চেনা ভাব থেকে যাচ্ছে। এত কাছে থেকেও ওকে আমি বুঝতে পারছি না। বিষয়টা মনিরের ক্ষেত্রেও ছিল। কিন্তু সেটা আলাদা। মনির কথা না বললেও মনের দিক থেকে আমার সাথে কোন দুরত্ব ছিল না। ওর মনের কথা আমি পরিস্কার বুঝতাম। অথচ আসিমভকে একেবারেই বুঝতে পারছি না।

মনির বলেছে ওর সাথে থাকতে। সম্ভবত এই কারনেই। আমাকে বুঝতে বলেছে ওর মনোভাব। হয়ত আসিমভ কখনো এমন কাউকে পায়নি যারসাথে মনখুলে কথা বলতে পারে। মনির সবসময়ই কাজপাগল। ওরজন্য সেটাই স্বাভাবিক। সে কারনে সবসময় একা একাই থাকতে হয়েছে আসিমভকে। সেটাই তার স্বভাবে পরিনত হয়েছে। সেই সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

মনেমনে ঠিক করে ফেললাম, আমাকেই উদ্দ্যোগ নিয়ে সেটা করাতে হবে। আসিমভ যাকিছু পছন্দ করে সেটা নিয়ে তার সাথে আলাপ করব।

দুঘন্টাতেও যখন বৃষ্টি থামল না তখন আরেকবার খেয়ে একটা বই হাতে নিয়ে বিছানায় গেলাম। আমার দিনে ঘুমিয়ে অভ্যেস নেই, কিন্তু চারিদিক এতটাই অন্ধকার আর অবিরাম বৃষ্টির শব্দ যে করার মত আর কিছু পেলাম না। বিছানায় যাবার সাথেসাথে ঘুম এসে গেল।

ঘুম ভাঙতে দেখি চারিদিক আলোয় ঝলমল করছে। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। মনে হয়েছিল গাড়ির ঝাঁকুনি খেয়ে শরীর ব্যথা হবে। বরং উল্টোটাই হয়েছে। সকাল থেকে শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল সেটা একেবারে সেরে গেছে।

হাতের কাছে বইটা একবার দেখলাম। এই বই এই বাড়িতে কিভাবে এল বুঝলাম না। কারো সাথেই মানায় না। একটা পরিবারের কে কি করেছে, কাকে কি বলেছে এই নিয়ে চারশ পাতার উপন্যাস। রীতিমত পাগলের ফ্যাক্টরী।

ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে চার। গরমের দিনে বিকেলের মাত্র শুরু। জানালা খুলে দিয়ে বাইরে এসে দেখি মনির বারান্দায় বসে। মনে হচ্ছে ওর বেশিরভাগ সময় এভাবেই কাটে। আমি পাশে গিয়ে বসলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আসিমভ কোথায়?'

মনির বলল, 'বাইরে গেছে। ও এই আবহাওয়া খুব পছন্দ করে। আর এমনিতেই-, ঘরে থাকতে বেশি পছন্দ করে না।'

ওর পরের কথাটার অর্থ আমার মাথায় ঢুকল না। আমি বললাম, 'আজ গাড়ি নিয়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল।'

মনির প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে তাকাল।

আমি ওকে খরগোস বাঁচাতে গিয়ে গাড়ির চাকা আটকে যাওয়া, আসিমভের টেনে উঠানোর ঘটনার বর্ননা দিলাম। মনির একটা কথাও বলল না। চুপ করে শুনে গেল। বলা শেষ হলেও কোন কথা বলল না।

আমাকে নিজে থেকেই বলতে হল, 'ওর গাড়ি উঠানো দেখে আমি খুব অবাক হয়েছি। ওর শরীরে অসম্ভব শক্তি।'

মনির আসে- করে বলল, 'অনেক সময় শরীরে যা শক্তি থাকে তারচেয়ে বেশি শক্তি মানুষ ব্যবহার করে।'

আমার অবাক লাগল শুনে। শক্তি যতখানি তারচেয়ে বেশি ব্যবহার করে কিভাবে? অবাক হয়ে বললাম, 'তারমানে?'

মনির কিছুক্ষন চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'তুমি কতটা ওজন উঠাতে পারবে তার একটা সীমা রয়েছে। তারচেয়ে বেশি ওজন উঠাতে চেষ্টা করলে মনে হবে সেটা তোমার সাধ্যের বাইরে। তোমার সাধ্য কতটুকু সেটা নির্দিষ্ট করে দেয় তোমার শরীরের নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা। সে ক্রমাগত তোমাকে বলে দিচ্ছে এরচেয়ে বেশি ওজন উঠিও না, সেটা তোমার ক্ষতি করবে। এই দুপুরে রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থেক না, তোমার ক্ষতি হবে। আর দৌড়িও না, তোমার পেশির ক্ষতি হবে,

হাড়ের ক্ষতি হবে। এই অনুভুতিগুলো ক্রমাগত সাবধান করে রক্ষা করছে তোমার শরীর। ইচ্ছে করলে তুমি এই কথা নাও শুনতে পার। যাদের প্রচন্ড মানষিক শক্তি তারা সেটা করে। প্রচন্ড বরফের মধ্যে, মরুভুমিতে দিনের পর দিন চলতে পারে। একজন সন্যাসী শুধু মনের জোরে দিনের পর দিন না খেয়ে, শীত-গরম সহ্য করে, মশার কামড়, সাপের ভয় সব অগ্রাহ্য করে ধ্যান করতে পারে। মন দিয়ে শরীরের সব অনুভুতিকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে।'

আসিমভের কাজের সাথে এর সম্পর্ক কতটুকু আমি বুঝলাম না। কি বলতে চাইছে সে? আসিমভ তার মনকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রন করতে পারে? তার হাতে ব্যথা লাগলেও সেটা অগ্রাহ্য করে কাজ করে যেতে পারে?

মনির তখনও বলে যাচ্ছে, 'একজন সিপ্রন্টার প্রতিদিন দৌড় প্রাকটিস করছে, এগার সেকেন্ড, বারো সেকেন্ড সময়ে একশ মিটার পার হচ্ছে, তারজন্য এটাই স্বাভাবিক সময়। সেই লোক যখন টুর্নামেন্টে দৌড়াচ্ছে তখন দশ সেকেন্ডের নিচে একশ মিটার পার হচ্ছে। এখানে কাজ করছে তার সেই মানষিক শক্তি। তাকে ক্রমাগত বলছে তাকে আরো বেশি কিছু করতে হবে। সাধ্যের বাইরে যেতে হবে। এই মানষিক শক্তি তাকে এই সীমারেখা পার করে দিচ্ছে।'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'তারমানে তুমি বলছ আসিমভ ইচ্ছে করলেই এই বাধা অতিক্রম করতে পারে। তার শারীরিক সামর্থের চেয়ে বেশি কাজ করতে পারে।'

হতাসভাবে শ্বাস ফেলল মনির। একটু সময় নিয়ে থেমে থেমে বলল, 'বিষয়টা তারচেয়েও খারাপ। ওরমধ্যে এই নিয়ন্ত্রন বিষয়টা নেই।'

আমি থ হয়ে গেলাম ওর কথা শুনে। বিষয়টা বুঝতে সময় লাগল আমার। বুঝে রীতিমত উত্তেজিতভাবে সামনে এগিয়ে বসলাম, 'তারমানে তুমি বলছ সে যে কোন পরিমান কাজ করতে পারবে। তার সামর্থের কোন লিমিট থাকবে না।'

মনির অনেকক্ষন তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। তারপর মাথা নিচু করল। ওর এই ভঙ্গি আমি চিনি। আমি যা বলেছি সেটা বোকার মত কথা। তারপর বলল, 'আমি বলতে চাইছি সে সেটাই করতে চাইবে। আর সেটা তারজন্য বিপদ ডেকে আনবে। এই ঘটনার কথাটাই ধর। গাড়িটার ওজন যদি আরও বেশি হত তাহলেও সে এই চেষ্টা করত। তার হাতে, কাঁধে, মেরুদন্ডে প্রচন্ড চাপ পরত। হয়ত মারাত্মক কোন ক্ষতি হতে পারত। তারপরও সে থামত না। আমি বহু সাধারন মানুষ দেখেছি যারা জোর করে ভারী জিনিষ উঠিয়ে সারাজীবন কোমড়ের ব্যথায় কষ্ট পেয়েছে। আসিমভের তেমন হতে পারত।'

আমি উত্তেজিতভাবে বললাম, 'কিন্তু কেন? ও নিজের বিপদ টের পাবে না কেন? আমি টিভিতে এমন মানুষ দেখেছি যাদের চামড়ায় অনুভুতি নেই। কোথাও খোঁচা লাগলে, কেটে গেলে, আগুনের স্যাকা লাগলেও টের পায়না। সেটা নাহয় চামড়ার কোষের বিষয়। তাদের কোষ অন্যরকম। আমিসভের বিষয় তো সে হিসেবে পরে না। তুমি যা বলছ তার অর্থ হচ্ছে নিজের কোনরকম বিপদই সে টের পাবে না। সেটা কিভাবে সম্ভব?'

মনির বলল, 'আমি বলছি না তার অনুভুতি নেই। সে পুরোপুরি স্বাভাবিক মানুষের মতই ব্যথা অনুভব করে। সেটাকে গুরুত্ব দেয় না। যেকাজ করতে চায় সেটাই করতে যায়।'

আমার মুখে ভাষা জোগাল না। আসিমভের অস্বাভাবিকত্ব তাহলে এইখানে। সে যদি ছাদ থেকে লাফ দেয়া প্রয়োজন মনে করে তাহলে লাভ দেবে। পরে পা ভাঙবে সেটা চিন্তা করবে না।

আমি বললাম, 'সেটা তো খুব বিপদজনক।'

মনির বলল, 'হ্যাঁ। যে কোন সময় সে নিজের বিপদ ডেকে আনতে পারে। কেউ একজন তার সাথে থেকে বিষয়টা বুঝানো প্রয়োজন। নয়ত কবে কি করে বসবে তার ঠিক নেই।'

কেউ একজন মানে আমি। এতক্ষনে একটু একটু করে আমার মাথায় আসছে বিষয়টা। এজন্যই আমাকে ওর সাথে থাকতে বলেছে মনির। সাথে থেকে ওকে বাস-বতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। ওকে বুঝাব ইচ্ছে করলেই সব করা যায় না। একটা সীমারেখা টানতে হয়। তার বাইরে গেলে নিজের বিপদ হয়।

রহস্যের সমাধান কতটা হল আর কতটা জটিল হল বুঝলাম না। দেখলাম আসিমভ হাতে একটা চটের ব্যাগ নিয়ে ভেতরে ঢুকছে। দুর থেকেই আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল।

মনির আসে- করে বলল, 'আম পেড়ে এনেছে। দেখ খেতে পার কিনা।'

আমি এগিয়ে গিয়ে ব্যাগটা হাতে নিলাম। বেশ ভারি। তবে ক্ষতি হওয়ার মত না নিশ্চয়ই।

আমগুলো দেখে অবাক হলাম আমি। বেশ বড়। প্রায় ফজলি আমের কাছাকাছি। সবচেয়ে যা অবাক করা তা হচ্ছে এর রঙ। বোঁটার দিক আপেলের মত টকটকে লাল। এধরনের একজাতের আম আমি দেখেছি। সেগুলো চ্যাপটা, লম্বাটে। এগুলো বেশ স্বাস্থ্যবান। আমি দেরি করতে পারলাম না। টেবিল থেকে ছুরি নিয়ে কেটে একটু মুখে দিলাম। আমার মুখ থেকে বিস্ময় বেরিয়ে এল, 'ব্যাপার কি বলত। এতদিন জানতাম ভাল আম যা হয় সব রাজশাহিতে নয় চাপাই নবাবগঞ্জে। এখানকার আমের খোঁজ কি দেশের লোক জানে না?'

মনির, আসিমভ দুজনেই হাসছে আমার কথা শুনে। আমি কিছুটা প্রশ্ন কিছুটা ঠাট্টার সুরে বললাম, 'কিছু করেছ নাকি? আমি একবার শুনেছিলাম এদিকের আম বড় হলে পোকায় ধরে। লোকজন রাতের বেলা অন্ধকারে আম খায়।'

মনির বলল, 'কিছু করা বলতে সামান্য ওষুধ দেয়া, যেন পোকা না ধরে। বাকিটা স্বাভাবিক।'

আমি 'হুঁ' বলে আম কাটতে শুরু করলাম। ছোটবেলার মত হাতেমুখে মাখামাখি করে আম খাওয়া সম্ভব না। অন্তত মনির সেটা করবে না। আপাতত কাটাকুটির কাজটা আমিই করি। আমগুলো পেকে গেলেও একেবারে নরম হয়নি। বেশ কয়েকটা আম কেটে প্লেট ভরিয়ে ফেললাম।

আম খেতে খেতে ছোটবেলার কথা মনে হল। মানুষ বড় হলে যখনই ভাল কিছু দেখে তখনই ছোটবেলার কথা মনে করে। যাকিছু ভাল তা যেন পিছনে ফেলে এসেছি।

এর মানে কি? আমরা কি ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছি? যাকিছু ভাল তা ক্রমেই হারিয়ে ফেলছি? এর শেষ কোথায়?

রাতে ঘুমাতে গিয়ে গতরাতের কথা মনে পড়ল। কেউ একজন উকি দিয়েছিল জানালা দিয়ে। কিছু একটা দেখার চেষ্টা করেছিল। সারাদিন ভুলেই গিয়েছিলাম সেকথা।

মনিরের কথামত সুইচটা খুঁজে বের করলাম। একেবারে হাতের কাছে। শুয়ে থেকে অনঅফ করা যায়। এটা নিশ্চয়ই টু-ওয়ে সুইচ। লাইন অন থাকলে অফ হবে, অফ থাকলে অন হবে। মনে মনে ঠিক করে রাখলাম, যতটা সম্ভব সতর্ক থাকতে চেষ্টা করব। যদি কোনরকম গড়মিল দেখি সুইচ অন করে দেব। এভোবে রাতের বেলা পরের জানালায় উকি দেয়ার মজাটা টের পাওয়াব।

কিন্তু কিছু ঘটল না। অথবা আমি জানার সুযোগ পেলাম না। এমনিতে আমার ঘুম বেশ হালকা। সামান্য শব্দ হলে টের পাই। অথচ এখানে আসার পর থেকে সেই নিয়ম একেবারে পাল্টে গেছে। বিছানায় শরীর রাখার সাথেসাথেই ঘুম নেমে আসছে চোখে। এক ঘুমে রাত কাবার হয়ে গেল। সকালে উঠে মনে মনে ঠিক করলাম, একবার জানালার বাইরেটা দেখে নেব। যদি কেউ এসেই থাকে হাটাচলার কিছু একটা চিহ্ন থাকতে পারে।

বাইরে গতকালের বৃষ্টির চিহ্নমাত্র নেই। পুরো যায়গাটাই উচুনিচু। সমস- পানি গড়িয়ে চলে গেছে কোথায় যেন। শুধু এখানে ওখানে গর্তে সামান্য পানি জমে আছে। টলটলে পরিস্কার পানি।

আসিমভকে বললাম, 'আজ বনের মধ্যে বেড়াতে যাব।'

আসিমভ মুখে কিছু বলল না। সামান্য হাসল। মুখ দেখে বুঝলাম ওর কোন আপত্তি নেই।

আমি উচু জুতা পায়ে দিয়ে মোটা সার্ট-প্যান্ট পরে তৈরী হলাম। প্রথমদিনের সাপের কথা আমার মনে আছে। এই বনে সাপ থাকাটাই স্বাভাবিক। তাদের থেকে?পোসাক দিয়ে যতটা সাবধানে থাকা যায়। আক্রমন করার মত অন্য কোন হিংস্র প্রাণী নেই এটা নিশ্চিত হয়েছি আগেই।

আসিমভ বলল ওর ক্যামেরাটা নেবে। সেখানে কিছু ছবি আছে সেগুলো কম্পিউটারে কপি করে যায়গা করতে হবে। আমি ওর সাথে গেলাম। সেখান থেকেই শুনলাম বাইরে গাড়ির শব্দ। এই গাড়িতে করেই আমি এসেছিলাম।

জানালার পর্দা সরিয়ে দেখলাম শফি একা। গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে ঢুকল। দোতলার দিকে একবার তাকিয়েও দেখল না।

কাজ শেষ করে ক্যামেরাটা ব্যাগে ভরে আমার হাতে দিল আসিমভ। ওর পোষাক পাল্টানো বাকি। আমি তাড়াতাড়ি করতে বলে নিচে নেমে এলাম। বাইরে বারান্দায় বের হওয়ার আগেই মনিরের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম, 'এসব কথায় কান দেবে না। বলে দেবে আমি নিষেধ করে দিয়েছি। আমাকে এসব বলে লাভ হবে না।'

মনিরের গলায় বিরক্তি। আমাকে দেখে যেন হোচট খেল দুজনই। কেউই চায়নি এই আলাপ আমার কানে আসুক। আমি বিষয়টা সামাল দেয়ার জন্য শফির দিকে ফিরে হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছেন?'

শফি হেঁসে মাথা নাড়ল।

আমি বললাম, 'ছবি তুলতে যাচ্ছি। যাবেন নাকি?'

শফি বলল, 'আজ যেতে পারব না। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।'

আমি ওদের সাথে বসলাম না। বারান্দার নিচে নেমে গেলাম। গেটের কাছে গিয়ে ক্যামেরা বের করে বাড়িটার দিকে ফোকাস করলাম।

যতটা সম্ভব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছি। আমার মুখ দেখে কেউ বুঝতে পারবে না আমার মনের মধ্যে কি ঝড় চলছে।

কিসের কথা বলছিল মনির? কাকে নিশেধ করছে সে? আগেও নিশেধ করেছে তাতে কাজ হয়নি। সেটা কে যে তার কথার ওপর কথা বলতে পারে? তাকে যে চেনে তার বোঝা উচিত ছিল সে এককথা একবারই বলে।

তাহলে?

কেউ কোন একটা বিষয়ে কথা বলতে চায়, মনির শুনতে চায় না। কি হতে পারে সেটা?

আমার মাথায় কিছুই আসছে না। একটু আগে পর্যন্ত মনে হচ্ছিল এখানে সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চলছে। এখন মনে হচ্ছে বিষয়টা আরো জটিল। আরো মানুষের ভুমিকা রয়েছে এখানে। এখানে উপসি'ত না থেকেও কিছু একটা করে যাচ্ছে।

সাথেসাথে রাতের লোকটার কথা মনে হল আমার। রাতের অতিথির জানালায় উকি মারার কারন কি সেটাই? কিছু একটা সে আশা করছে এখানে।

আসিমভ দেরি করছে। আর আমার মন বলছে অসুস্থ মনিরকে একা রেখে যাওয়া উচিত হচ্ছে না। শফিকে নিয়ে আমার ভয় নেই। যতদুর জেনেছি লোকটা বিশ্বস-। মনিরকে অসম্ভব রকমের ভক্তি করে। মনিরদের সাথে পরিচয়ও অনেকদিনের। আর লোকটার পরিবার রয়েছে। এখানে পরিবার নিয়ে বেড়াতে আসে। এমন মানুষ জেনেশুনে খারাপ কাজের সাথে জড়ায় না। কিন্তু লোকটা সরল। চালবাজ কোন লোক ওকে ফাঁদে ফেলতে পারবে অনায়াসে।

মনেমনে ঠিক করে ফেললাম, বেশিদুর যাব না। আশেপাশেই ঘোরাফেরা করব। গাছপালা, ফুল-পাখি দেখাই যদি বিষয় হয় তাহলে কাছেই কি দুরেই কি। সব যায়গা কমবেশি একই রকম।

আসিমভ তৈরী হয়ে বাইরে আসায় প্রথমদিন যে কৃষ্ণচুড়ার কাছে গিয়েছিলাম সেদিকে রওনা দিলাম। বেশিদুর যাওয়া প্রয়োজন হল না। একঝাঁক শালিকের চেঁচামেচি শুনে সেখানেই ছবি উঠানোর প্রস্তুতি নিলাম।

পরিবেশ স্বাভাবিক করার জন্য আসিমভের সাথে আলাপ জুড়ে দিলাম, 'তুমি কতরকম শালিক চেন?'

আসিমভ বলল, 'তিনরকম।'

এটাই স্বাভাবিক উত্তর। আমি হেঁসে বললাম, 'ময়নাও একধরনের শালিক তা জান?'

আসিমভ বোকার মত হাসল।

এবার প্রশ্ন করলাম, 'একটা শালিক দেখলে কি হয় জান?'

এটা নিশ্চয়ই ওর জানা নেই। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। আমি হেঁসে বললাম, 'সাথেসাথে আরেকটা খুঁজে বের করতে হয়। নাহলে বন্ধুর সাথে ঝগড়া হয়।'

আসিমভ হাসতে হাসতে গাছের দিকে তাকাল। ওখানে একজোড়া না, রীতিমত কয়েকজোড়া শালিক। লালমাথা একটা টিয়া চোখে পরল। তারপর হঠাৎ করেই মনে হল যেন পাখির রাজ্যে এসে পরেছি। একটু করে এগিয়ে যাই আর নতুন নতুন পাখি চোখে পরে। কিছুক্ষনের মধ্যেই বেনেবউ, সাতভাই, মোহনচুড়া এমনকি বসন্তবৌরী দেখে ফেললাম। একসময় কত চেষ্টা করেও এসব পাখি দেখার সুযোগ পাইনি। আর আজ একদিনে, এত কাছাকাছি সব পাখি এসে হাজির।

আসিমভকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন পাখির ডাক সবচেয়ে সুন্দর বলতো?'

আসিমভ বলল, 'দোয়েল।'

'হুঁ।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোকিল না কেন?'

আসিমভ বলল, 'কোকিলের ডাকও সুন্দর।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'শ্যামার ডাক শুনেছ?'

আসিমভ বলল, 'না।'

আমি নিজেও এই পাখির কথা শুধু শুনেই এসেছি। কখনো চোখে দেখার সুযোগ পাইনি। যদিও ছবি দেখেছি ভাল করে। যদি সামনে পরে চিনতে সমস্যা হবে না। আসিমভকে বললাম, 'চল খুঁজে দেখি পাওয়া যায় কিনা। ক্যামেরাটা ধর।'

আমি কয়েকটা ছবি উঠিয়েছি। এবার ক্যামেরা ব্যাগ ওর হাতে তুলে দিলাম।

গাছপালার মধ্যে দিয়ে ফাঁকা যায়গা ধরে আমরা এগিয়ে গেলাম সামনে। দুর থেকে গাছগুলোকে যতটা ঘন মনে হয় কাছ থেকে ততটা মনে হয়না। বড় গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে বেশ ফাঁকা যায়গা। মাটিতে ঝোপও খুব বেশি নেই। সাপের ভয় এড়িয়েই আমরা এগিয়ে একটা ফাঁকা যায়গায় এসে দাঁড়ালাম। একটু পরই যেন আরেকটা বন শুরু হয়েছে।

আসিমভ হঠাৎ করেই বলল, 'একটু দাঁড়ান, আমি আসছি।'

আমি কিছু বলার আগেই ঘুরে পিছনদিকে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

আমি সেখানেই একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে শুরু করলাম।

কোথায় গেল আসিমভ? বাড়িতে?

শফিকে কি বিশ্বাস করছে না সে? মনিরের কোন বিপদ আশংকা করছে?

যদি বাড়িতে যায় সেটা ভালই। ও বোকা না মোটেই। বরং বয়সের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। অনেক শক্তিশালী। তেমন কিছু দেখলে আমার চেয়েও দক্ষতার সাথে সেটা মোকাবেলা করতে পারবে।

কিন্তু কিসের বিপদ হতে পারে? শফি জেনেশুনে মনিরের জন্য ক্ষতিকর এমন কিছু করবে না। আমি একেবারে নিশ্চিত এবিষয়ে। মানুষ চিনতে আমার যত ভুলই হোক, এতবড় ভূল হতে পারে না।

আমার বারবারই মনে হচ্ছে আরো লোকের বিষয় রয়েছে এখানে।

ভাবতে ভাবতে আনমনে হাঁটতে শুরু করলাম। কতক্ষন কেটেছে জানি না, হঠাৎ করেই একটা শব্দ শুনে ঘুরে তাকালাম। রাস্তার মত যে চলার পথ তারই পাশে ঝোপটা নড়ছে। এর পরের ঘটনাটা ঘটল এতই দ্রুত যে আমি কিছু বুঝে ওঠার সময় পেলাম না। ঝোপের মধ্যে

থেকে একজন লাফিয়ে বেরিয়ে এল। তার হাতে লম্বা একটা ছুরি। সেটা ধরল আমার পেটের কাছে। তার পেছনে আরেকজন এগিয়ে আসছে। ডানদিক থেকে আরেকজন।

দেখতে দেখতে তিনজন আমার তিনদিকে দাঁড়াল। আমি দেখে নিলাম তিনজনকেই। ছুরি হাতে লোকটা খাটো এবং রোগা। শক্তিতে আমার সাথে পারবে না। কিন্তু আমি এতটুকু নড়লাম না। চাপ দিলে ছুরিটা আমার শরীরের একদিক দিয়ে ঢুকে আরেকদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

এ অবস্থায় মাথা ঠান্ডা রাখতে হয়। আমি দেখেছি ওদের হাতে অস্ত্র একটাই। আচমকা আক্রমন করে তাকে কাবু করা সম্ভব। অস্ত্র হাতে পেলে, এমনকি ওদের হাতছাড়া হলে তিনজনকেই কাবু করা সম্ভব। ওদের নিশ্চয়ই মার্শাল আর্টের ট্রেণিং নেই। আমার সামান্য হলেও আছে। প্রয়োজন সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করা। আপাতত ওদেরকে বুঝতে দেয়া আমি কিছু করতে যাচ্ছি না।

আমার সে পরিকল্পনা মুহুর্তে বাতিল করতে হল। অন্যদিক থেকে আসা লম্বা লোকটা আমার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আমার ডানহাত মুচরে ধরে পেছনের দিকে নিয়ে গেল। আরেকজন সাথেসাথে একটা কালো কাপড়ের ব্যাগ ঢুকিয়ে দিল আমার মাথায়। সমস- কিছু অন্ধকার হয়ে গেল আমার সামনে। শুধু শব্দ শুনে আর ওদের স্পর্শে বুঝতে পারছি কি ঘটছে। দ্রুতহাতে আমার পকেট হাতরাল একজন। যাকিছু ছিল সব ওদের কাছে চলে গেল। হাতের ঘড়িটা খুলে গেল। তারপরই দুহাত পেছনে বেঁধে ফেলা হল। সবকিছু ঘটে গেল মিনিট খানেক, বড়জোর মিনিট দুয়ের মধ্যে।

এবার পিছন থেকে একজন ধাক্কা মারল। তারমানে হাঁটতে হবে। আমি দেখতে পাচ্ছি না কিছুই। হাঁটতে গিয়ে হোচট খেলাম। তখন একজন এসে বাহুর কাছে ধরল। তার হাঁটার সাথে মিল রেখে হাঁটতে শুরু করলাম।

আমি বোঝার চেষ্টা করছি পরিসি'তি কি। এরা কে।

নিশ্চয়ই চোর-ডাকাত জাতিয় কিছু। শুরুতেই টাকাপয়সা আর অন্যান্য দামী যাকিছু পেয়েছে হাতিয়ে নিয়েছে। এরপর চেষ্টা করছে আটকে রেখে যদি আরো কিছু পাওয়া যায়।

কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাকে? ওদের আস্তানায়? মনিরের বাড়ি থেকে খুব বেশিদুর আসিনি। এতকাছে যদি তেমন কিছু থাকে তাহলে মনিরের জানা স্বাভাবিক ছিল। এটা নিশ্চয়ই একমাত্র ঘটনা না। এরা হয়ত এখানেই থাকে। নিয়মিতই এধরনের কাজ করে।

আবারও সেই চিন্তাটা ফিরে এল। এদের হাতে ভাল অস্ত্র নেই। যদি কোথাও আটকে রাখেও, সেখান থেকে কিছু একটা করা সম্ভব। এদের হাত থেকে পালানো সম্ভব। আমার মন বলছে এরা যা করছে সেই কাজে খুব দক্ষ না। এটা মনির সংক্রান্ত কোন বিষয় না। আমাকে সামনে পেয়ে লাভজনক কিছু মনে করেছে।

আসিমভ গেল কোথায়?

হাঁটতে হাঁটতে প্রায়ই হোচট খাচ্ছি। গাছের ডাল এসে বাড়ি মারছে মুখে। কোনদিকে যাচ্ছি বোঝার চেষ্টা করলাম। আমার দিক ভূল হয়ে গেছে। শরীরে রোদ এসে পড়লে বুঝতে পারছি সুর্যটা আমার ডানদিকে। নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে দুরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে।

চারিদিকে মাঝেমাঝে পাখির ডাক ছাড়া কোন শব্দ নেই। তারপরই শব্দ শুনতে পেলাম। কারো দৌড়ানোর শব্দ। ওদের সাথেসাথে আমিও থামলাম। আমার বাহু ধরে রাখা হাতটা সরে গেল। দেখতে দেখতে শব্দটা একেবারে কাছে এসে গেল। আমাকে ধাক্কা মারল কে যেন।

সম্ভবত পিছনের লম্বা লোকটা। আমি হুমড়ি খেয়ে পরে গেলাম মাটিতে। হুটোপুটির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কে যেন চাপা চিৎকার করে উঠল। মাঝপথেই থেমে গেল সেটা। মনে হচ্ছে হাতাহাতি হচ্ছে। তারপরই ঝোপের মধ্যে কারো দৌড়ে যাওয়ার শব্দ, তারপরই সব চুপচাপ।

আমি বসে আছি মাটির ওপর। বেশ কিছুক্ষন সেভাবেই বসে অপেক্ষা করলাম। এখন কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। পাখির ডাকও থেমে গেছে। চারিদিক একেবারে নিশ্চুপ।

কিছু একটা ঘটেছে। কোন কারনে ওরা আমাকে এভাবে ফেলে রেখেই পালিয়েছে।

এখানে এভাবে বসে থাকার কোন অর্থ হয় না। আমি উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম। মাথার ওপরে একটা গাছের ডাল। সেটাকে পাশ কাটিয়ে কোনমতে উঠে দাঁড়ালাম। দুপা সামনে এগোতে আবার হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। কোন কিছুতে পা বেঁধেছে।

পা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম সেটা কি। মনে হচ্ছে একজন মানুষ। পা বাড়িয়ে নাড়া দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম। আমার পায়ের ধাক্কা খেয়েও নড়ল না।

আমার মন বলছে মারাত্মক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। আমাকে পালাতে হবে এখান থেকে। এদের থেকে যতদুর যাওয়া যায় যেতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব বাড়ির দিকে যেতে হবে। আমি দেখতে পাচ্ছি না কিছু। দুহাত পেছনে বাঁধা। সেই অবস্থাতেই আবারও উঠে দাঁড়ালাম। এবারে ধাক্কা খেলাম গাছের সাথে।

নাহ। আমাকে বুদ্ধি খাঁটাতে হবে। এভাবে হাত-চোখ বাধা অবস্থায় আমি বেশিদুর যেতে পারব না। কোনদিকে যাব তারও ঠিক নেই।

কোনমতে গাছটা ঠাহর করে তার গায়ে হেলান দিয়ে বসলাম। প্রথমে চোখ খুলতে হবে। গাছের গায়ে মাথার ঢাকনাটা লাগিয়ে টান দিতে চেষ্টা করলাম। আটকানোর মত কিছুই পেলাম না। চাপ লেগে সামান্য সরে গেল শুধু।

কয়েকবার চেষ্টা করেও কাজ হল না। রীতিমত হাফিয়ে গেছি আমি। বসে মাথা ঠান্ডা করতে চেষ্টা করলাম।

কি করতে পারি আমি। টানাটানি করে হাত খোলা সম্ভব না। যে দড়ি দিয়ে বেধেছে সেটা ছেড়াও আমার সাধ্যের বাইরে। মোচর দিয়ে সেটা আল্গা করার চেষ্টা করলাম। লাভ হলনা তেমন।

হঠাৎ করে নিজের ওপরই বিরক্তি এসে গেল আমার। সত্যিই কি বোকা আমি। কত দেরীতে আমার মাথা কাজ করে। আমার মাথার ঢাকনাটা বাঁধা নেই। আলগাভাবে গলা পর্যন্ত পড়ানো। আর এটা খুলতে পারছি না।

বসে দুহাটু ভাঁজ করলাম। মাথা নুইয়ে দুহাটুর মধ্যে এনে হাঁটু দিয়ে ঢাকনাটা চেপে ধরলাম। মাথা সরাতেই সেটা খসে থেকে গেল হাটুর মধ্যে। সামনের পৃথিবী দেখতে পেলাম আবার।

এতক্ষন যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে ছিল। ভাল করে শ্বাস নিয়ে চারিদিকে তাকালাম। একটু দুরে দুজন লোক পরে রয়েছে মাটিতে। এদেরই একজন আমার পেটে ছুরি ধরেছিল, আরেকজন ঢাকনাটা মাথায় পরিয়েছিল। দুজনের কেউ নড়াচড়া করছে না। পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে একজনের ঘাড় মুচরে দিয়েছে কেউ। মুখটা হা হয়ে রয়েছে। আরেকজনের মুখ দেখা যাচ্ছে না।

তৃতীয় লোকটা নেই।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। লোকদুজনের কাছে লম্বা ছুরিটা পরে রয়েছে। আমি ওটা দিয়ে হাতের বাঁধন কাটার চেষ্টা করতে পারি। আমার সাহসে কুলাল না। ওরা যদি জ্ঞান হারিয়ে থাকে, যদি জ্ঞান ফিরে পায়। আমার আগেই যদি অস্ত্রটা তুলে নেয়। নিশ্চিতভাবে আমাকে খুন করবে।

আমি বাঁধা হাত টানাটানি করতে করতে উল্টোদিকে ঘুরে হাঁটতে শুরু করলাম। আমার মন বলছে আমি দিক ভুল করিনি। আমি বাড়ির দিকে যাচ্ছি। বেশ কিছুটা হাঁটার পর সামনের দিকে নড়াচড়া দেখতে পেলাম। সাথেসাথে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালাম।

আসিমভ। চারিদিকে দেখতে দেখতে এগিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই আমাকে খুঁজছে। আমি বেরিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালাম।

'আপনার কিছু হয়নি তো?' আসিমভ জিজ্ঞেস করল।

আমি ওকে আস্বস- করে বললাম, 'না। দেখতো এটা খোলা যায় কিনা।'

দেখতে দেখতে আসিমভ আমার হাতের বাঁধন খুলে দিল। আমি ছাড়া পেয়ে হাত মোচরাতে মোচরাতে জিজ্ঞেস করলাম, 'লোকগুলো কে?'

আসিমভ ওর পেছনদিকে একবার তাকিয়ে নির্লিপ্তভাবে বলল, 'মনে হয় খারাপ লোক।'

ওরা খারাপ লোক একথা মনে না করার কি আছে বুঝলাম না। খারাপ না হলে এভাবে আমাকে আক্রমন করে হাত বাঁধবে কেন? পকেটের জিনিষপত্র বের করে নেবে কেন?

আসিমভের দৃষ্টি আমার চোখ এড়ায়নি। উত্তর দেয়ার আগে সে নিজের পেছনদিকে তাকিয়েছে। অথচ দুজন লোক পড়ে রয়েছে আমার পেছন দিকে। ওদিকে কি আছে তাহলে? তৃতীয় জন?

আসিমভ সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'চলুন বাড়ির দিকে যাই।'

আমি ওর কথা না শুনে কোনাকুনি হাত দেখিয়ে বললাম, 'এদিক দিয়ে যাই।'

আসিমভ আপত্তি করল না। অথবা আমি ওকে আপত্তি করার সুযোগ দিলাম না। আমি পা বাড়ালাম। আসিমভ যায়গাটা ভালভাবে চেনে। ওর পথ ভুল করার কোন কারন নেই। কিন্তু আমার দৃষ্টি অন্যদিকে। আমি নিশ্চিত হতে চাই তৃতীয়জন এদিকে আছে কিনা। আসিমভ এখনো ছেলেমানুষ। চালাকিতে আমার সাথে পারবে না। ওকে বুঝতে না দিয়ে আমাকে জানতে হবে সবকিছু।

কিছুক্ষন পরই আমি যা দেখতে চেয়েছি তা দেখতে পেলাম। সরাসরি না তাকিয়েও বুঝতে কষ্ট হল না লম্বা লোকটা পরে রয়েছে একটা ঝোপের আড়ালে। পা বেরিয়ে রয়েছে ঝোপ থেকে। কালো রঙের প্যান্ট পড়নে। এটা অন্য কেউ হতে পারে না।

আমি ভালভাবে সেদিকে না তাকিয়ে সেদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকলাম। সবকিছু রহস্যজনক মনে হচ্ছে আমার কাছে। আসিমভ আমাকে না জানিয়ে গেল কোথায়? এত দ্রুত ফিরেই বা এলো কিভাবে?

আমি নিশ্চিত ওই তিনজনকে আক্রমন করেছে সে। দুজনকে কাবু করেছে সেখানে। তৃতিয়জন দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করেছিল। পালাতে পারেনি। আসিমভ তিনজনকেই খুন করেছে।

মনির ওর শক্তির যে ব্যাখ্যাই দিক না কেন, এটা একেবারেই অস্বাভাবিক। শুধুমাত্র মনের জোর দিয়ে একজন কিশোর এমন কাজ করতে পারে না। ওর চেহারায় এই খুনের বিন্দুমাত্র ছাপ পড়েনি। আসিমভ কখনোই স্বাভাবিক মানুষ না।

মনিরের ব্যাখ্যার বাইরে আরোকিছু রয়েছে ওর মধ্যে।

বাড়ি ফিরে দেখলাম শফি তখনো বারান্দায় বসে কথা বলছে মনিরের সাথে। দুজনের বসে থাকার ভঙ্গিতে, আলাপ করার বিষয়ে কোন অস্বাভাবিক কিছু নজরে পরল না আমার।

আবারও প্রশ্নটা আমার মনে উকি দিয়ে গেল। আসিমভ কি আমাকে একা রেখে বাড়িতে আসেনি? নাকি দুর থেকে দেখে ফিরে গেছে।

আমি নিজেই চায়ের পানি গরম করতে দিয়ে ভাল করে হাতমুখ ধুয়ে এলাম। আমাকে দেখে বোঝার উপায় নেই এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে এরই মধ্যে। চা তৈরী করে এনে মনির-শফির সাথে আলাপে যোগ দিলাম।

শফি অনেকটা সংকোচ কাটিয়ে উঠেছে। ওকে সবসময়ই আমার খুব লাজুক স্বভাবের মনে হয়েছে। আমার সাথে কখনো ভালভাবে কথা বলেনি। এবারে নিজের কাজের কথা, পরিবারের কথা শোনাল। একটা মাঝারি আকারের দোকান আছে তার। সবধরনের জিনিষপত্র বিক্রি হয় সেখানে। নিজে কখনো দোকানে বসে না। তার এক শ্যালক আর বেতনভোগী কর্মচারীরা সবকিছু দেখাশোনা করে। তার স্ত্রী স্কুল শিক্ষক। গল্প করার সময় সে সবচেয়ে বেশি শোনাল তার ছেলের কথা। এখনই সে কতটা বুদ্ধিমান সেকথা বলে একাএকাই হাসল।

আমি যতটা সম্ভব চেষ্টা করে স্বাভাবিক রেখেছি নিজেকে। মুখভাবে কথায় আমার মনের কথা প্রকাশ পেতে দিচ্ছি না। আমার মন থেকে কিছুতেই দুশ্চিন্তা বিদায় হচ্ছে না। অনবরত নতুন নতুন চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। তারই মধ্যে হঠাৎ করে নতুন ভাবনা চেপে বসল।

বিষয়টা মনিরের কাজ সম্পর্কিত নয়তো!

মনির অসম্ভব রকমের প্রতিভাবান। কাজ থেকে দুরে থাকার কথা যতই বলুন, আসলে সে কাজ বাদ দেয়নি। ল্যাবরেটরীতে আমি ওর নোট দেখেছি। কিছু একটা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে সে। হয়তো কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ নেই, কারো ফরমায়েসি কাজ করছে না। কিন্তু মাথা থেকে কাজ বিদায় করতে পারেনি। কিছু একটা নিয়ে ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছে।

যদি কেউ সেটা হাত করতে চায়?

প্রতিভাবানদের পেছনে লেগে থাকা লোকের অভাব নেই। কেউ ব্যবসায়িক কারনে, কেউ পরের কৃতিত্ব নিজের বলে চালানোর জন্য, শর্টকাটে নিজেকে খুব বড় কিছু বলে তুলে ধরার জন্য। এধরনের মানুষ করতে পারে না এমন কাজ নেই।

ধারনাটা ক্রমেই আমার মাথায় চেপে বসল। মনে হচ্ছে এটাই ঠিক। কেউ একজন তার গবেষনার কাগজপত্র কিংবা অন্যকিছু হাত করতে চাইছে। হয়ত টাকা দিয়ে কিংবা অন্যভাবে মনিরকে রাজি করাতে চেষ্টা করেছে। মনির নিষেধ করে দিয়েছে। হয়তো কাউকে দিয়ে চুরি করানোর চেষ্টাও করেছে। রাতের সেই লোকটার আসার কারন সেটাই। সে হয়তো আশা করেনি আমি থাকব। ধরে নিয়েছিল বাড়িতে আসিমভ আর মনির এই দুজন থাকবে। আমি থাকায় হিসেবে গড়মিল হয়ে গেছে।

এটাই ঠিক। আমি মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, মনিরের কাজের বিষয়ে খোঁজ নেব। ওকে জেনেশুনে এভাবে বিপদের মধ্যে ছেড়ে দেয়া যায় না। সে আমাকে সবকিছু থেকে আড়ালে রাখতে চাইছে। সে জানে বিপদ হতে পারে। বিপদের মধ্যে আমি কোনভাবে জড়াই সেটা সে চায় না। কিন্তু আমি তা হতে দিতে পারি না।

শফি যাওয়ার পর আমি সুযোগ খুজতে থাকলাম কখন মনিরকে একা পাব। সুযোগ পেয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কাজের বিষয় কি ছিল?'

মনির একবার তাকিয়ে দেখল আমাকে। বোধহয় কারন বোঝার চেষ্টা করছে। অথবা কতটুকু বললে আমি কি বুঝব সেটা ভাবছে। আমার তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। মনির আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। ছোটবেলায় ছিল, এখনো আছে। ওর কোনরকম আপত্তির কারন থাকতে পারে এমন কাজের কথা কখনো ভাবিনি। সেটা বুঝতে ওর সমস্যা হবার কথা না।

একসময় আসে- করে বলল, 'একে কিছুটা রোবোটিক্স এর সাথে তুলনা করতে পার। তবে রোবট তৈরীর বিষয় না। বিষয়টা পুরোপুরি মানুষ সম্পর্কিত। বিভিন্ন কারনে মানুষের নানারকম জটিল সমস্যা দেখা দেয়। রোবটবিদ্যা দিয়ে তার সমাধান কতটা সম্ভব সেই বিষয়।'

আমার মাথায় ঢুকল না। আবারও একই প্রশ্ন করতে হল, 'সেটা কেমন?'

মনির জিজ্ঞেস করল, 'পেসমেকার কি জানো নিশ্চয়ই?'

আমি বললাম, 'জানি। হার্ট ঠিকমত কাজ না করলে একটা যন্ত্র লাগিয়ে দেয়।'

মনির বলল, 'ঠিক। হার্ট যা করতে পারে না এই যন্ত্র সেই কাজ করে দেয়। মানুষে মসি-স্কেও এধরনের যন্ত্রের ব্যবহার রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশের কথাই ধর। তার মাথায় এধরনের যন্ত্র লাগানো আছে যা তাকে চিন্তা করতে সহায়তা করে।'

আমি বললাম, 'ভাইস প্রেসিডেন্টের বুকে পেসমেকার লাগানো আছে।'

মনির কথায় বাধা পেয়ে থামল। তারপর আসে- করে বলল, 'হ্যাঁ।'

আমি উত্তেজিতভাবে বললাম, 'কিন্তু এর বিপদও তো আছে। আমি একজন পেসমেকার লাগানো মানুষ দেখেছি। আকাশে বিদ্যুত চমকানোর সময় প্রায় মরতে বসেছিল।'

মনির বলল, 'হ্যাঁ। এধরনের যন্ত্র ব্যবহারের সময় বাইরের বিদ্যুত তরঙ্গ থেকে সাবধানে থাকতে হয়। এগুলো যে কোন সময় মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে। এখন বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে। এইসব কৃত্রিম যন্ত্রগুলো অনেক ভালভাবে কাজ করে। তারপরও তোমার কথা ঠিক। কোন পরিসি'তিতে কোন বিপদ ডেকে আনবে তা আমরা এখনও জানি না। কিন্তু আমার গবেষনার বিষয় এধরনের যন্ত্র নিয়ে না। একে যন্ত্র না বলে কৃত্রিম কোষও বলতে পার। শরীরের অন্যান্য কোষগুলোর সাথে এর আচরনে কোন পার্থক্য থাকবে না অথচ এগুলো নিয়ন্ত্রন করা যাবে। কম্পিউটার প্রোগ্রাম দিয়ে যেভাবে যন্ত্র নিয়ন্ত্রন করা যায় সেভাবে। যার যেমন প্রয়োজন তারজন্য তেমন প্রোগ্রাম লিখে ব্যবহার করা যাবে।'

এরচেয়ে বেশি বললে আমি বুঝব না। আর অতিরিক্ত প্রশ্ন করলে সেও বিরক্ত হবে। আমার আগের ধারনাই আরো বদ্ধমুল হল। মনেহল সে কাজ ছেড়ে দেয়ার পর এবিষয়ে আরো সামনে এগিয়েছে। কেউ একজন সে খবর জানে। সে তার গবেষনার ফল হাত করতে চায়। সে শফিকে দিয়ে প্রস্তাব দিয়েছে আর মনির ফিরিয়ে দিয়েছে।

যদি সেটাই হয়, আমি নিশ্চিত সে বা তারা সহজে হাল ছেড়ে দেবে না। যতরকমভাবে সম্ভব চেষ্টা চালিয়ে যাবে। সেটা মনিরের জন্য বিপদজনক হলেও।

শেষ প্রশ্নটা করলাম তার কাজ সম্পর্কে, 'তোমার কাজ কোন অবস্থায়?'

মনির সময় নিল উত্তর দিতে। থেমে থেমে আসে- আসে- বলল, 'আমি নিজেই কনফিউজড। কখনো কখনো মনে হয় করতে পারলে অনেক মানুষের উপকার হবে। আরেকবার ভাবি মানুষের জীবনে নানারকম সমস্যা হবে, একসময় মৃত্যুবরন করবে এটাই তো স্বাভাবিক। মানুষে জীবনে দুঃখ কষ্ট, রোগ-শোক এসব তো থাকবেই। সেকারনেই মানুষ জীবনকে ভালবাসে। পরিবারে, সমাজে একসাথে বাস করে।'

আমি মনেমনে ঠিক করে ফেললাম, মনিরের গবেষনার কাগজগুলো দেখব। ওকে কোনমতে বুঝিয়ে একসময় ওগুলো নিয়ে কপি করে ফেলব। স্ক্যানার আছে। কম্পিউটারে ঢুকিয়ে ফেলতে কোন সমস্যাই হবে না। তারপর নিরাপদ কোথাও রাখার ব্যবস্থা নেব।

এদিকে আসিমভকে নিয়েও দুশ্চিন্তা হচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে এভাবে একা থাকা ওর ক্ষতি করছে। ওর সমাজে অনেক মানুষের সাথে থাকা উচিত। সমাজের অন্য মানুষ কিভাবে চলে দেখে শেখা উচিত। এই পরিবেশে আমার পক্ষে ওকে সেটা শেখানো কঠিন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'শফি আবার কবে আসবে?'

মনির বলল, 'কালদিন পর। ছুটি আছে, ওর বউ-ছেলে নিয়ে আসবে।'

ভালই হল। শফি এলে ওকে এরমধ্যে জড়াব। একটা দিন হাতে আছে। এরই মধ্যে আমাকে সবকিছু গুছিয়ে নিতে হবে। আমি মনেমনে ঠিক করে ফেললাম সবকিছু। অভ্যেসবসেই হাত চলে গেল বামহাতের দিকে। ঘড়িটা নেই সেখানে।

মনিরকে জানানো প্রয়োজন। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এদিকে আসেপাশে কোথাও খারাপ লোকজন থাকে?'

মনির জিজ্ঞেস করল, 'কেমন?'

আমি বললাম, 'বনের মধ্যে তিনজন লোক আমাকে অস্ত্র দেখিয়ে অপহরন করতে চেষ্টা করেছিল। ঘড়ি-টাকাপয়সা যাকিছু ছিল সেগুলো হারিয়েছি।'

মনির বলল, 'ও, তোমাকে আগে সাবধান করা উচিত ছিল। ওদিকে অপহরনের ঘটনা ঘটে। লোকজনকে আটকে রেখে টাকা পয়সা দাবী করে। তুমি দুরে কোথায় গেলে সাবধানে যেও।'

আমার বলতে ইচ্ছে হল দুরে না, রীতিমত বাড়ির কাছে।

মনির ওর হাতঘড়িটা খুলে বাড়িয়ে দিল, 'এটা হাতে রাখ। তোমাকে ঘড়ি ছাড়া মানায় না।'

আমি আপত্তি করলাম না। এখানে ঘড়ি দেখার কোন প্রয়োজন নেই। কোন কাজই সময় হিসেব করে করতে হচ্ছে না। তবুও, এটা আমার বহুদিনের অভ্যেস। অকারনে হাত উল্টে ঘড়ি দেখা।

আমি ঘড়িটা হাতে দিয়ে দেখলাম চমৎকার মানিয়েছে। নিশ্চয়ই অনেক দামি ঘড়ি। শুনেছি একটা হাতঘড়ির দাম কয়েক লক্ষ টাকাও নাকি হয়। আমি ভেতরে যাওয়ার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। আর দেখলাম মনির ওর বুকটা চেপে ধরেছে। সামনের দিকে কুঁজো হয়ে গেছে।

'কি হল?' আমি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ওকে ধরলাম।

মনির তাড়াতাড়ি সামাল দিল, 'কিছু না। আসিমভ কোথায় দেখ তো-'

আমি দৌড় দিলাম। দুবার জোরে আসিমভের নাম ধরে ডাকতেই ও ছুটে এল। মনির তাকে হাত দিয়ে ইসারা করতেই আবার দৌড়ে ভেতরে ঢুকল। এবার ফিরল একহাতে পানির গ্লাশ নিয়ে। আরেক হাতে নিশ্চয়ই ট্যাবলেট। মনির সাথেসাথে সেটা নিয়ে মুখে দিয়ে খেয়ে ফেলল। পানি খেয়ে কিছুটা সুসি'র হয়ে চোখ বন্ধ করল। চোখ বন্ধ করে ধীরে ধীরে বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে। আমি ওর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

না। এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। আমার মনে হল শফি আগামীকাল এলে ভাল হত। জোর করে হলেও ওকে শহরে নিতে হবে। এখানে কোন বিপদ হলে দেখার কেউ নেই। মনিরকে ডাক্তারের কাছাকাছি রাখতে হবে। অন্তত ওর সত্যিকারের অবস্থা কি সেটা জানতে হবে। আমার কোন ধরনের রুগী দেখেই অভ্যেস নেই। কি করলে অসুস্থ মানুষের উপকার হয় সে সম্পর্কে কোন ধারনা নেই। এ অবস্থায় রাখলে ও নির্ঘাত মারা যাবে।

একটু পর মনির ওঠার উদ্দোগ নিল। আমি আর আসিমভ দুজন দুদিক থেকে ধরে ওকে ওর ঘরে নিয়ে গেলাম। বিছানায় শুয়ে ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

'চিন্তা কোর না। একটু পরই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আশ্চর্য্য। ওর এই শারীরিক অবস্থায় আমার চিন্তা করা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। আমার মন খারাপ হয়ে গেল।

ওকে বিশ্রাম নিতে দিয়ে বারান্দায় এসে চুপ করে বসে থাকলাম। একবার ফিরে গিয়ে আসিমভকে বললাম কিছু করতে হলে যেন বিন্দুমাত্র দেরি না করে আমাকে জানায়। আসিমভ মাথা নেড়ে সায় দিল। সে বসে থাকল ওর বিছানার কাছে।

মনির সারাদিন ঘর থেকে বের হল না। আসিমভ হয় ওর কাছে থাকছে নয়ত এটাওটা কাজ করছে। ঘর পরিস্কার করা, রান্নাবান্না করা থেকে শুরু করে যতরকম কাজ সবই সে করে যাচ্ছে। আমি সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, সে রাজি হয়নি। আমি কিছুক্ষন বারান্দায় বসে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম, কিছুক্ষন একা একাই সামনের রাস্তায় হাটাহাটি করলাম। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যে হল। কিভাবে পরিসি'তি ভালোর দিকে নেয়া যায় সি'র করতে চেষ্টা করলাম, কোন সমাধান পেলাম না।

এখানে টেলিফোন নেই। মনির সরাসরি উল্লেখ না করলেও বুঝেছি সে ইচ্ছে করে এধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা রাখেনি।

একেবারে নিরবে কেটে গেল সারাটা দিন। বাড়িতে অসুস্থ মানুষ। ওর অসুস্থতা কতখানি যাচাই করার সামর্থ্য আমার নেই। শুধু মনে হচ্ছে ওর পুরো বিশ্রাম দরকার। ওকে সেটাই করতে দিলাম। রাতে শোবার সময় সুইচটা অন করলাম। আমার ভয় হচ্ছে যে কোন সময় কেউ এসে বাড়িতে ঢুকতে পারে। সম্ভবত এই জানালাটাই ভেতরে ঢোকার জন্য সুবিধাজনক। যদি সেটা হয়েই থাকে, সে চেষ্টা আবারো করে, তার শিক্ষা হওয়া উচিত।

কিছুই ঘটল না রাতে। সকালে মনিরকে কিছুটা সুস্থ্য দেখলাম। টেবিলে বসে আমাদের সাথে নাস্তা খেল। তারপর কিছুক্ষন বারান্দায় বসে তার ঘরে চলে গেল।

একবার চিন্তা করলাম কোন কারন দেখিয়ে আসিমভকে বাইরে পাঠানো যায় কিনা। যুক্তসংগত কোন কারন পেলাম না। আসিমভ দুধ আনতে যায় দুদিন পরপর। প্রয়োজনীয় অন্য সবকিছু সবসময় বাড়িতেই থাকে। বরং বাইরে যাওয়ার কথা বলায় সে বলল আমি নিজেই যেন হাঁটাহাটি করে আসি। এবং বনের দিকে না যাই।

আর কিছু করার না পেয়ে নিজেই বের হলাম বাইরে। ঠিক করেছি রাস্তা ধরে যতটা সম্ভব এগিয়ে যাব। গাড়ি চলার রাস্তা যখন রয়েছে তখন কেউ না কেউ এসে পরতেও পারে। অনেকেই গাড়ি নিয়ে বেড়াতে পছন্দ করে। এমন যায়গার খোঁজ পেলে বেড়াতে আসার মানুষের অভাব হওয়ার কথা না। তেমন কাউকে দেখলে আগেই খবর পাঠাব শফির কাছে।

মুল রাস্তায় এসে শহরের দিকে রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। এখনো দুপুর না হলেও রোদের তাপ খুব বেশি। প্রায়ই গাছের ছায়া খুঁজতে হচ্ছে। প্রায় ঘন্টাখানেক হাঁটার পরও জনমানুষের দেখা পেলাম না। তখন থামতে হল।

আমার এখানে আসতে যদি একঘন্টা সময় লাগে তাহলে ফিরতে আরো এক ঘন্টা লাগবে। তারমানে দুপুর। এভাবে বাইরে দেরি করার অর্থ হয় না।

রাস্তা ছেড়ে গাছপালার ভেতরের পথ ধরলাম। এখান থেকে বাড়িটা সোজা কোনদিকে আন্দাজ করতে পারি। ভূল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। কোনাকুনি গেলে কম সময়ে গাছের ছায়ায় ছায়ায় যেতে পারব।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, এ কোথায়, কিসের মধ্যে এসে পরেছি আমি। চারিদিকে জনমানুষের চিহ্নমাত্র নেই। শুধুই গাছপালা আর পশুপাখি। এরই মধ্যে একটা বাড়িতে অসুস্থ একজন মানুষ। আমার ছোটবেলার বন্ধু।

মনির বলেছে সুখ-দুঃখ, রোগ শোক নিয়ে মানুষের জীবন। এজন্যই মানুষ একসাথে থাকে। ওর কথাই হয়তো ঠিক। ও অসুস্থ বলেই হয়ত ওর দিকে আমার ঝোঁক আরো বেড়েছে। মনে হচ্ছে ওকে রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। প্রয়োজনে নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও ওরজন্য আমি চেষ্টা করে যাব।

আর আছে আসিমভ। রহস্যময় এক বালক। আমি এখনো বুঝে উঠতে পারিনি ওকে ভাল বলব না মন্দ। সামনাসামনি দেখে ওকে পছন্দ না করে উপায় নেই। অথচ কত অনায়াসে সে তিনজনকে মেরে ফেলেছে। হয়ত মেরে ফেলার প্রয়োজন ছিল না। তৃতীয়জন তাকে চিনেছে। চিনেই পালাতে চেষ্টা করেছে। তারপরও তাকে মরতে হয়েছে। আসিমভ জেনেছে কত সহজে একজন মানুষকে মেরে ফেলা যায়। এ খুবই মারাত্মক অভিজ্ঞতা। এখনই সাবধান হওয়া প্রয়োজন। নয়ত আসিমভ আরো খারাপ অবস্থার দিকে যাবে। কাউকে মেরে ফেলা কতটা খারাপ কাজ সেটা এখনো বুঝে ওঠেনি ও। ওকে বুঝানো প্রয়োজন।

অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে একসময় আমার পা থমকে দাঁড়াল। আমার দৃষ্টি আটকে গেল সামনের একটা ঝোপের দিকে। প্রথমে চোখে পড়ল রঙিন কাপড়, তারপরই একজোড়া পা।

দেখে প্রথমেই আমার মনে পড়ল সেই লম্বা লোকটার কথা। তাকে একই ভঙ্গিতে পড়ে থাকতে দেখেছি। একবার দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই লোকটা বেঁটে। মুখটা ঝোপের মধ্যে ঢুকানো

বলে চেহারা দেখার কোন সম্ভাবনা নেই। চেনার প্রয়োজনও নেই। ওর পোষাক আমি চিনেছি। এই পোষাক পড়নে ছবি দেখেছি আসিমভের কম্পিউটারে। ওদের বাড়িতে কাজ করত। মোকলেস নাম।

আমার পা কাঁপতে শুরু করল। কোনমতে নিজেকে সামাল দিয়ে মুখ ঘুরালাম। টলতে টলতে কয়েক পা সামনে এসে বসে পরলাম একটা গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে।

মোকলেস খুন হয়েছে। ওকে খুন করে ফেলে রাখা হয়েছে বনের মধ্যে। মনির জানেনা সেটা। ওর সম্পর্কে যেকটা কথা সে বলেছে তাতে আমার সেটাই মনে হয়। মনির অন্তত আমার কাছে মিথ্যে সাজাবে না। যদি মোকলেসের খুন হওয়ার বিষয়টা জানত তাহলে সেটা বলত, অথবা ওর কথা পুরোপুরি এড়িয়ে যেত আমার কাছ থেকে।

তক্ষুনি মনে পরল আসিমভের কথা।

এটা ওরই কাজ। ওর শরীরে অস্বাভাবিক শক্তি। তারচেয়ে অনেক বড় মানুষকে সে অনায়াসে খুন করেছে। তিনজন অস্ত্রধারী মানুষকে সে অনায়াসে কাবু করেছে। মোকলেসকেও খুন করেছে সে। যে কোন কারনেই হোক, করেছে। বিষয়টা লুকিয়ে রেখেছে মনিরের কাছে।

আসিমভের আচরন অস্বাভাবিক। কখন কি করবে ঠিক নেই। কিছু করতে চাইলে ওকে ঠেকানোও অসম্ভব।

মনিরকে জানানো প্রয়োজন।

মনির জানেনা আসিমভ কত ভয়ংকর কাজ করেছে। করে চলেছে। বাধা না দিলে আরো করবে। ওর সুন্দর চেহারার পিছনে লুকিয়ে আছে ফ্রাংকেনষ্টাইনের দানব। জেকিল কখনো কখনো হয়ে ওঠে হাইড। ঠিক কোন সময়ে কি কারনে সে ভয়ংকর হয়ে ওঠে আমি জানি না, তবে সেটা হয়।

একটামাত্র ঘটনা হলে আমি বিষয়টাকে পাত্তা দিতাম না। এখন মনে হচ্ছে ওর মধ্যে অশুভ কোন শক্তি কাজ করছে। কোন কারনে সে খুন করতে পছন্দ করছে। হয়ত প্রয়োজনে, হয়তো তুচ্ছ কারনে, হয়ত অকারনে সে খুন করেছে মোখলেসকে। একবার যাকে খুনের নেশায় পায় তাকে ফেরানো যায় না।

একমাত্র মনিরের পক্ষেই সম্ভব কোন ব্যবস্থা নেয়া।

টলতে টলতে কোনমতে উঠে দাঁড়ালাম। মোকলেসের দিকে আরেকবার তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে হল না। প্রচন্ড গরমে ঘামতে ঘামতে বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

হাঁটতে হাঁটতে মনসি'র করে ফেললাম। আসিমভকে কিছু বুঝতে দেব না। নিজের আচরন স্বাভাবিক রাখব। আমি মোকলেসের মৃতদেহ দেখেছি সেকথা কোনভাবে প্রকাশ পেতে দেব না। আড়ালে মনিরকে জানাব সবকথা। মনির অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আসিমভকে সে যে দৃষ্টিতেই দেখুক না কেন, আমার কথা শুনবে। সত্য যাচাই করবে। ওর বুদ্ধি এখনো লোপ পায়নি। ন্যায়-অন্যায়বোধ পুরোপুরি রয়েছে। কাউকে খুন করার বিষয় সে কখনো সহজভাবে দেখবে না। সেই খুনি আসিমভ হোক আর যেই হোক।

বাড়িতে ঢুকে কোথাও কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। মনিরের ঘরে ঢুকে দেখলাম সে নেই। বাথরুমের দরজা খোলা। পুরো নিচতলা ঘুরে দেখলাম। মনির নেই। আসিমভও নেই।

আসিমভের ঘরে যায়নি তো!

সিড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলাম। আসিমভের ঘরের দরজা খোলা। আসিমভ নেই। অন্য ঘরগুলো দেখলাম। কোথাও কেউ নেই। বাইরে জিপটা থেমে রয়েছে। তারমানে গাড়ি নিয়ে কেউ যায়নি।

আশ্চর্য্য। এই অসুস্থ শরীর নিয়ে মনির গেল কোথায়? আসিমভ কোথাও গেলে যেতে পারে, কিন্তু মনির?

ঘরের বাইরে এসে বারান্দা থেকে নামলাম। মনে মনে নিজেকেই বোঝাতে চেষ্টা করলাম, মনির হয়ত খোলা হাওয়ায় গেছে। আসেপাশে একটু হাঁটাহাটি করে ফিরে আসবে। গেটের বাইরে এসে একটু হাঁটাহাটি করলাম। আবার ফিরে এলাম বারান্দায়।

ক্রমেই দুশ্চিন্তা এসে ভর করতে শুরু করল। কোন দুর্ঘটনা ঘটল নাতো। শেষ চেষ্টা হিসেবে বারান্দা থেকে নেমে বাড়ির পিছনদিকে রওনা হলাম। এদিকে একবারও যাইনি। মনির ওদিকে যেতে পারে। ছোট্ট একটা জলাশয় আছে সেখানে। তার ধারে বসে থাকতে পারে ।

আমার ঘরের জানালার পাশ দিয়ে পিছনদিকে এসে দাঁড়ালাম। কারো চিহ্নমাত্র নেই। চারিদিকে ফাঁকা যায়গা যেন হাহাকার করছে।

একেবারে হাওয়ায় মিশে গেছে দুজন মানুষ। বাড়িতে অস্বাভাবিক কিছু দেখিনি যা থেকে অন্যকিছু মনে হতে পারে। কেউ এসে আক্রমন করলে অথবা অন্যকিছু হলে দেখে বোঝা যেত। বাড়ির সবকিছু ঠিক যায়গামত রয়েছে। শুধু দুজন মানুষ যেন সবকিছু রেখে বেড়াতে গেছে কিছু না জানিয়ে।

আমার শরীর ভারি হয়ে এসেছে। সারা গা ভিজে গেছে ঘামে। একে এই রৌদ্রের মধ্যে দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছি তারপর এখানে এই পরিসি'তি।

বাড়ির ছায়ায় বসে বিষয়টা আরেকবার ঝালাই করলাম মনে মনে। কি হতে পারে? হতে পারে, আসিমভ হয়ত মনিরকে নিয়ে বনের মধ্যে গেছে কোন কারনে। এছাড়া আর কোন কারনের কথা মাথায় এল না। বাড়ির সামনে গিয়ে জোরে ডাকাডাকি করলে সাড়া পাওয়া যাবে।

সেটা করার জন্য উঠতে গিয়েই চোখ গেল যেখানে বসে ছিলাম সেখানে। প্রায় মাটির গা ঘেসে কাঁচের জানালা। পাশাপাশি তিনটা বড় বড় জানালা। ল্যাবরেটরীতে এই কাঁচ দিয়েই রোদ ঢুকতে দেখেছিলাম। ল্যাবরেটরীতে আলো জ্বলছে।

নিজের ওপরই বিরক্তি এসে গেল আমার। আমার মাথা এত দেরীতে কাজ করে কেন? একবারের জন্যও মনে হয়নি মনির ল্যাবরেটরীতে থাকতে পারে। ওর জন্য সেটাই তো স্বাভাবিক। ওর কাজ নিয়েই যদি কোন ঝামেলার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সে সেটা গুছিয়ে রাখবে।

আমি এগিয়ে গিয়ে কাঁচে মাথা ঠেকিয়ে নিচের দিকে তাকালাম। যা দেখলাম তাতে নিজে থেকে ছিটকে সরে গেল আমার মাথা।

আমি ঝাঁকি দিয়ে মাথা পরিস্কার করতে চেষ্টা করলাম। না, আমার মাথা ঠিকই আছে। আমি ভুল দেখিনি।

ঘরের মাঝখানে উজ্বল আলো জ্বলছে। সেখানে টেবিলে চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে মনির। বুকের কাছে, চারিদিকে সাদা কাপড় রক্তে ভিজে আছে। ওর বুকের ওপর ঝুঁকে আছে আসিমভ। হাতে ছুরি।

আমার আরেকবার দেখার সাহস হল না। এদৃশ্য আমি দেখতে চাই না। আমি ভাবতে চাইনা এমন ঘটনার কথা।

আসিমভ খুনী। ও খুন করেছে মনিরকে। খুনের নেশায় পেয়েছে ওকে। কি কারনে জানি না, আমি ছিলাম না এই সুযোগে মনিরকে ল্যাবরেটরীতে নিয়ে খুন করেছে।

ও জানে না খুন করা কি। যাকে ইচ্ছে করবে তাকেই খুন করবে ও। এই মুহুর্তে সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছি আমি। যদি কোনমতে টের পায় আমি ওর স্বরূপ জেনে ফেলেছি, ও কি করেছে আমি দেখেছি, সকলের আগে আমাকে বিদায় করবে পৃথিবী থেকে। আমাকে খুন করার জন্য এই কারন যথেষ্ট। তারপর সে তার নিজের মত চলতে থাকবে। আরো কত খুন হবে কে জানে।

আমার হাতপা অবস হয়ে এসেছে। মাথা এখনো ঠিকভাবে কাজ করছে। আমাকে বারবার বলে দিচ্ছে পালাতে হবে। সময় শেষ হবার আগেই পালাতে হবে এখান থেকে। কোনমতেই মাথাগরম করা চলবে না। কোনরকম ভূল করা চলবে না। আসিমভ এখনও ব্যস-। মনিরকে নিয়ে কি করছে জানি না। সেটা শেষ হলেই আমার খোঁজ করবে। তার আগেই পালাতে হবে আমাকে। ওর শক্তির সাথে পেরে ওঠার কোন সম্ভাবনা আমার নেই। মুহুর্তে আমার ঘাড় মটকে দেবে ও।

কোনমতে শরীরে শক্তি সঞ্চয় করে পিছিয়ে এসে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর ঘুরেই দৌড় দিলাম। গেট পেরিয়ে সোজা রাস্তা দিয়ে একবার যাওয়া পথে আবার এসে পড়লাম। একবারের জন্য মনে হল গাড়ি চালানোটা শিখে নেয়া উচিত ছিল। মনিরের জিপটা থেমে রয়েছে গেটের পাশে। অনায়াসে সেটা নিয়ে পালানো যেত। এখন আমাকে যেতে হবে ঘুরপথে। মুল রাস্তা এড়িয়ে। আসিমভ টের পেলেই গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করবে। রাস্তায় ধরে ফেলবে আমাকে।

হাঁটতে হাঁটতে কোনপথে যাব ঠিক করে ফেললাম। যেতে হবে বনের গাছপালার মধ্যে দিয়ে। রাস্তা এড়িয়ে, ধনুকের মত পথে। তারপর সেই ব্রিজটার কাছে। ওখানে অপেক্ষা করলে গাড়ি-রিক্সা কিছু একটা পাওয়া যাবে। যদি না পাওয়া যায়, ওখান থেকে সোজা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাব। ওদিকে দুএকজন হলেও মানুষের যাতায়াত আছে। দোকানপাট, ঘরবাড়িও দেখেছি। ওরাই আমাকে সাহায্য করবে। আসিমভ অন্য মানুষের সামনে কিছু করে সাহস পাবে না।

খুঁজে বের করতে পারব শফিকে। ওর বাড়ি চিনি না কিন্তু দোকানের নাম মনে আছে। খোঁজ করলে তাকে বের করা যাবে। তারপর। সোজা যেতে হবে থানায়। সবকিছু জানিয়ে পুলিশ নিয়ে এসে পুরো বাড়িটা চেক করাব। এই পিশাচকে ছেড়ে দেয়া অসম্ভব। মনির হত্যার বদলা আমি নেবই নেব।

ঘন্টাখানে, নাকি ঘন্টাদুয়েক আমি এলাপাতারি হেঁটে চললাম বনে মধ্যে দিয়ে। আমার পা চলছে না। প্রতিপদে হোচট খাচ্ছি। আর আমার মন ক্রমাগত বলছে, আর সময় নেই। এখনি যেতে হবে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রীতিমত ব্যথা করছে গলার কাছে। জামা ভিজে গায়ের সাথে এটে গেছে।

একসময় থামলাম। এভাবে ছুটে চলা বোকামি। আমাকে কাজ শেষ করতে হবে। তাতে দুঘন্টার যায়গায় চার ঘন্টা লাগলে কিছু যায় আসে না। এভাবে ছুটে চলার চেষ্টা করলে আমি ক্লান্ত হয়ে এই বনেই মরে পড়ে থাকব। কেউ জানতে পারবে না আমার কি হয়েছে।

এবার গতি কমালাম। অনুমান করছি মাইলদশেক চলে এসেছি। ব্রীজটা সম্ভবত কাছেই। এর কাছেই আরেকটা রাস্তা আছে। সেটা দিয়ে গাড়ি চলতে দেখেছি। আমাকে অন্তত ব্রীজটার কাছে যেতে হবে।

বন থেকে বাইরের দিকে যাওয়ার জন্য দিক পরিবর্তন করলাম। আমার পা রীতিমত টলছে। সামান্য শক্তিও অবশিষ্ট নেই। আশেপাশের গাছ ধরে কোনমতে ফাঁকায় এসে দাঁড়ালাম। রাস্তা দেখা যাচ্ছে। দুরে ব্রিজটা দেখা যাচ্ছে। আমার যায়গা চিনতে ভূল হয়নি।

কিন্তু আমার এখানে থাকা চলবে না। অন্তত ফাঁকা যায়গায় যেতে হবে। সেখানে জ্ঞান হারালেও ওদিক কেউ যাবার সময় আমাকে দেখতে পাবে।

শরীরের সমস- শক্তি একসাথে করে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করলাম। মনিরের বলা কথা মনে হল। চেষ্টা করলে শরীরের শক্তিকে বশ মানানো যায়। আমি এখন সেই পর্যায়ে পৌছে গেছি। শুধুমাত্র মনের জোরে ফাঁকা যায়গায় এসে দাঁড়ালাম। বড় একটা গাছ এখানে। কি গাছ দেখার আগ্রহও আমার নেই। কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে গাছের গোড়ায় পৌছলাম। ঘুরে হেলান দিয়ে বসলাম।

নিজে থেকেই চোখ বন্ধ হয়ে এল। আমার শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। সামনের রাস্তায় গাড়ি দেখতে পেলেও আমি রাস্তা পর্যন্ত যেতে পারব না। ডাকতে পারব কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ রয়েছে। আমি জ্ঞান হারাতে যাচ্ছি। যদি কোন গাড়ি আসে, যদি কেউ গাড়ি থেকে আমাকে পড়ে থাকতে দেখে, যদি গাড়ি থামিয়ে খোঁজ নিতে আসে তবেই আমি বাঁচব।

চোখ খোলা রাখতে চেষ্টা করছি। নিজে থেকেই বারবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এরই ফাঁকে কিছু যেন চোখে পরল।

একটা গাড়ি। এগিয়ে আসছে রাস্তা ধরে। আমি যেদিকে আশা করেছি সেদিকে না। যেপথে আমি এসেছি সেই পথে। ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসছে আমার দৃষ্টি। তারপর অন্ধকার হয়ে এল। শেষ মুহূর্তে দেখতে পেলাম গাড়িটা থামল। মনিরের জিপ। সেখান থেকে লাফিয়ে নামল আসিমভ। এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

আমার আর কিছু মনে নেই।

কোথায় যেন গান বাজছে। রবীন্দ্র সঙ্গিত। আজি বিজন ঘরে। পংকজ মল্লিকের গান।

আমি চোখ খুলতে চেষ্টা করলাম। চোখের পাতা ভারি হয়ে আছে। বহু কষ্টে চোখের পাতা খুললাম। সামনে উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাধিয়ে গেল। চোখ বন্ধ করে সামলে নিতে চেষ্টা করলাম।

আমার সারা শরীরে ব্যথা। আমি শুয়ে রয়েছি বিছানায়। মনিরের বাড়িতে। সামান্য সময়েও আমি জানালার পর্দার রঙ দেখতে পেয়েছি। লতাপাতাফুল আঁকা পর্দা। বাইরে বড়বড় ফুলগাছের মাথায় শেষ বিকেলের রোদ।

'কেমন লাগছে এখন?'

কথা শুনে চোখ মেললাম আবার। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম মনির বসে রয়েছে। বিছানার একটু দুরে বড় হেলানো চেয়ারে। গায়ে চাদর জড়ানো।

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম, 'তুমি!'

মনির বলল, 'উঠো না। তোমার বিশ্রাম দরকার। ওই গ্লাশ থেকে সরবতটুকু খেয়ে নাও। ডিহাইড্রেশন হয়েছে তোমার।'

আমি দেখলাম বিছানার কাছেই টেবিলের কোনায় বড় একটা গ্লাশ। কথা না বলে হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে খেতে শুরু করলাম। মনে হচ্ছে গলার ভেতরটা একেবারে বুক পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। যেদিক দিয়ে তরল যাচ্ছে সেখানে ব্যথা করছে। এসময় তাড়াহুড়ো করতে হয় না। আমি আসে- আসে- গ্লাশের সমস- পানিয় খেয়ে ফেললাম। লেবু, চিনি ছাড়াও ঝাঝালো কিছু মেশানো রয়েছে তাতে। হয়ত কোন বিশেষ লবন।

খাওয়া শেষে গ্লাশটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বালিশ টেনে নিয়ে হেলান দিয়ে বসলাম। সত্যিই অসম্ভব ক্লানি- লাগছে আমার। মনে হচ্ছে দাঁড়াতে চেষ্টা করলে দাঁড়াতে পারব না। পরে যাব মেঝেয়। শরীরের মাংশপেশিগুলো কাঁপছে তিরতির করে।

আধশোয়া হয়ে জানালা দিয়ে আরেকবার বাইরে দেখলাম। সন্ধ্যে হতে আরো ঘন্টাখানেক বাকি।

'আসিমভ কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

মনির বলল, 'ও একটু বাইরে গেছে। কিছুক্ষনের মধ্যেই চলে আসবে। তুমি ওদিকে বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলে কোথায়?'

আমি অবাক হলাম ওর কথা শুনে। না হয়ে পারলাম না। আমি বনের মধ্যে যাচ্ছিলাম সেটা সে জানল কিভাবে? জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি জানলে কিভাবে আমি কোথায়?'

মনির বলল, 'ও তোমাকে জানানো হয়নি। তোমাকে যে ঘড়িটা দিয়েছিলাম ওতে জিপিএস লাগানো আছে।'

'কেন?'

মনির কেশে গলা পরিস্কার করল। তারপর সহজভাবেই বলল, 'একবার তোমাকে অপহরন করার চেষ্টা হয়েছিল। সেজন্য কোন ঝুঁকি নিতে চাইনি।'

তারমানে আমি চাইলেও পালাতে পারতাম না। আমি কোথায় আছি ঠিক বের করে ফেলত। ঘড়িটা কোথায় দেখার চেষ্টা করলাম। ওটা খুলে টেবিলের ওপর রাখা।

আমি বুঝতে পারছি না কথাটা কিভাবে বলব। আমি দেখেছি মনির মরে পরে আছে। তার ওপর ছুরি হাতে আসিমভ কি যেন করছে। আর এখন দেখছি সে দিব্বি বসে কথা বলছে আমার সাথে। গায়ে ঢিলে একটা পোষাক, তার ওপর চাদর জড়ানো। চেহারা ফ্যাকাসে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি ঠিক আছো?'

মনির বলল, 'হ্যাঁ। শরীরটা একটু দুর্বল কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। দুচারদিনে পুরো ভাল হয়ে উঠব।'

আমি বলল, 'আমি ভেবেছিলাম আসিমভ তোমাকে খুন করেছে।'

মনির অবাক হয়ে বলল, 'সেকি ! ও আমাকে খুন করবে কেন? আসিমভ খুব ভাল ছেলে। ও আমাকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসে।'

আমি উত্তেজিতভাবে বললাম, 'কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমি দেখলাম তুমি টেবিলে শুয়ে আছো, চারিদিকে রক্ত, আসিমভের হাতে ছুরি।'

বেশ কিছুক্ষন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল মনির। আমি অপেক্ষা করছি।

আমি দোটানায় পরে গেলাম। গড়মিলটা কোথায়? জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কি ভুল দেখেছি?'

'তুমি ঠিকই দেখেছ?' একসময় আসে- করে বলল সে।

আমি হতভম্ভ হয়ে গেলাম।

আমি যা দেখেছি সেটা সত্যি। সে টেবিলে শুয়ে ছিল, আসিমভের হাতে ছুরি ছিল, তার শরীরে, চারিদিকে রক্ত ছিল সব সত্যি!

কি বলব খুঁজে পেলাম না। কোনমতে বললাম, 'তাহলে?'

মনির বলল, 'এখানে একটু ভূল হয়েছে। তোমার বোঝার ভূল হয়েছে। আমার বাইপাস সার্জারী করার কথা ছিল। ভেবেছিলাম একটু ভাল হলে যাব। কিন্তু হঠাৎ করেই অবস্থা এমন খারাপ হয়ে গেল যে অন্যকিছু করার ছিল না। তুমি আসিমভকে অপারেশন করতে দেখেছ।'

আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না।

আসিমভ তার হার্টের অপারেশন করছিল। আমাকে না জানিয়ে। সেজন্যই আমাকে একা সময় কাটাতে বাইরে পাঠিয়েছিল। কিন্তু কথা সেটা না। কথা হচ্ছে আসিমভ হার্টের অপারেশন করে কিভাবে?

আমি কোনমতে বললাম, 'তুমি বলছ চৌদ্দ বছরের এক কিশোর তোমার বাইপাস সার্জারী করেছে?'

মনির বলল, 'হ্যাঁ করেছে। আসিমভকে চৌদ্দ বছরের কিশোর হিসেবে দেখাটা ঠিক না। সারা পৃথিবীতে ওর মত নিখুঁত সার্জন আরেকজন পাওয়া যাবে না। আসিমভ-'

আমি তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বাধা দিয়ে বললাম, 'তোমার কথার মাথামুন্ডু আমি কিছু বুঝছি না। সেই শুরু থেকেই আমাকে বিভ্রান্ত করছ। আসিমভ পৃথিবীর সব ভাষা জানে, ফ্রিৎজ খেলে কম্পিউটারকে হারায়, পৃথিবীর সব জ্ঞান ওর করায়ত্ত, শক্তিতে অসাধারন। এখন বলছ সে পৃথিবীর সেরা হার্ট সার্জন। এই পরিবেশে, কোন উন্নত যন্ত্রপাতি ছাড়া, কারো সাহায্য ছাড়া সে তোমার বাইপাস সার্জারী করেছে আর কয়েকঘন্টার মধ্যে তুমি সুস্থ হয়ে বসে আমার সাথে কথা বলছ? এসব আমাকে বিশ্বাস করতে বল?'

মনির কিছুক্ষন অপলক তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। তারপর নিচু গলায় বলল, 'এটা আমারই ভূল। কথাটা তোমাকে আগে বলা উচিত ছিল। আমি ভেবেছিলাম ওরসাথে থেকে, ওর আচরন দেখে তুমি কিছু ধারনা করতে পারবে, তখন বুঝিয়ে বলব। দেখা যাচ্ছে সেটা হয়নি। আসিমভ সাধারন মানুষ না। ওর চিন্তা নিয়ন্ত্রন করে একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম। সেকারনে ওর মাথা কাজ করে কম্পিউটারের মত। নির্ভূল গানিতিক হিসেব করে।'

আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। হতবাক হয়ে চেয়ে থাকলাম ওর দিকে। বিষয়টা তাহলে এই। এই বিষয়ে গবেষনার কথাই তো সে বলেছিল।

মনির কথাটা বলে মাথা নিচু করে বসে রয়েছে। নিজের পায়ের দিকে চেয়ে রয়েছে। ওর পায়ে সাদা রঙের নক্সাকরা স্যান্ডেল।

আমি ভাবতে পারছি না। গত কয়েকদিন ধরে যার সাথে ঘুরছি, গল্প করছি, একসাথে খাচ্ছি, ঘুমাচ্ছি সে একটা আধামানুষ, আধাযন্ত্র। ওর কারসাজি। কম্পিউটার প্রোগাম মেনে চলছে। আমার বিশ্বাস হল না। নিশ্চয়ই আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে। যান্ত্রিক যদি হয় তাহলে মানুষের মত আচরন করবে না। তার চলাফেরায়, কাজে কর্মে মানুষ থেকে আরো পার্থক্য ধরা পরবে।

আমি অবিশ্বাসের সুরে বললাম, 'তুমি বলছ ও একটা যন্ত্র!'

মনির সাথেসাথে বাধা দিয়ে বলল, 'না-না। সেকথা বল না। আমারই বলা ভূল হয়েছে। ও পুরোপুরি একজন মানুষ। আমার বলা উচিত ছিল অতিমানুষ। সাধারন মানুষের যাকিছু বৈশিষ্ট থাকে সবই ওর আছে। সেইসাথে অতিরিক্ত কিছু আছে। সেটা মানুষের তৈরী।'

'তোমার তৈরী?'

মনির আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমার প্রশ্ন বোঝার চেষ্টা করল। আমার মনে হল সে আহত হয়েছে আমার কথা শুনে। তারপর একসময় আসে- করে জানা কথাটা বলেই ফেলল।

'হ্যাঁ।'

এবারে আমার ক্ষোভ গিয়ে পড়ল মনিরের ওপর। লোকে বলে মানুষ জ্ঞানের চুড়ায় উঠলে জ্ঞানপাপী হয়। নিজেকে ঈশ্বর বলে ভাবতে শুরু করে। কাজের সীমা কতটুকু ভুলে যায়। মনির নিজেকে সেই পর্যায়ে নিয়ে গেছে। একজন মানুষের শরীরে যন্ত্র বসাতে ইতস-ত করেনি।

আমি এ বিষয়ে কিছুই বুঝি না। পত্রপত্রিকায় যেটুকু খবর পাই সেটাই আমার সম্বল। জানি সারা পৃথিবীতে এনিয়ে বিতর্ক চলছে। তার ওপর ভর করে যতটা সম্ভব সহজভাবে বলতে চেষ্টা করলাম, 'বিষয়টা কতটা ভয়ংকর তুমি জান। গিনিপিগ, ইদুর নিয়ে গবেষনা করায়ও সারা পৃথিবীর মানুষ আপত্তি জানাচ্ছে। অনেক যায়গায় রীতিমত আইন করে বলে দেয়া হয়েছে কি করা যাবে কি করা যাবে না। আর তুমি এসব করছ মানুষ নিয়ে? জান এটা কতটা অনৈতিক কাজ?'

ভাবলাম ও রেগে যাবে। তর্ক করবে। নিজের যুক্তি দেখাবে। কিন্তু রাগল না। কিছুই বলল না। মুখ ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল। আসে- করে বলল, 'নৈতিক-অনৈতিকের সীমারেখা কি স্পষ্ট?'

আমি উত্তর খুঁজে পেলাম না। জানি যে উত্তরই দেই না কেন যুক্তিতে ওরসাথে পারব না। তারচেয়ে ও নিজে থেকেই ব্যাখ্যা করুক। ওকে যা চিনি তাতে সেটাই সে করবে। করা উচিত।

মনির বলল, 'আমি বিষয়টা নিয়ে অনেক ভেবেছি। সবসময় সেজন্য আমার নিজেকে অপরাধী মনে হয়। মনে হয় ওকে ওর স্বাভাবিক জীবন থেকে বঞ্চিত করেছি আমি। কিন্তু আমি কি করতে পারতাম বল। ও মারা যাচ্ছিল। বলতে পার মরেই গিয়েছিল। ওই অংশটুকু লাগিয়ে ওকে বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে। এখন ও বেঁচে আছে। হেসেখেলে বেড়াচ্ছে। তুমি কি শুধু আমার দোষটাই দেখবে?'

ওর গলার স্বর কেঁপে গেল।

আমি ওর মুখ দেখার চেষ্টা করলাম। মায়া হল দেখে। ওর অপারেশনের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে এই সময় ওর এভাবে চেয়ারে বসে থাকার কথা না। ওর বিশ্রাম প্রয়োজন। শুধুমাত্র আমার কথা ভেবেই এই শরীর নিয়ে চেয়ারে বসে অপেক্ষা করেছে। আসিমভকে হয়তো পাঠিয়েছে কোন কাজে।

অথবা হয়ত আমাকে কথাগুলো বলবে বলে ওকে সরিয়ে রেখেছে। অকারনে কিছু একটা ছুতো তৈরী করে বাইরে পাঠিয়েছে।

আমি বলার মত কিছু খুঁজে পেলাম না।

বাইরে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। বারান্দার সামনে থেমেছে। একটু পরই আসিমভকে দেখা গেল। ঘরে ঢুকে আমাকে বসে থাকতে দেখে মুখে হাসি ফুটল ওর। এটা সেই আসিমভ। ওর মুখে সেই পরিচিত, শিশুসুলভ হাসি।

ওর বামহাতে একটা কাগজের বড় প্যাকেট। বুকের কাছে চেপে ধরে রেখেছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে দোকান থেকে কিনে আনা। জানিনা কার জন্য, আমার না মনিরের। আরেকহাতে একগোছা ফুল।

এগিয়ে এসে ফুলগুলো বাড়িয়ে ধরল আমার দিকে।

(শেষ)